# গদ্য

## গল্প ও প্রবন্ধ

# বাংলা-লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। আনুমানিক সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের মাতৃভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এগুলো কবিতার আঙ্গিকে রচিত। চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত কাব্যচর্চার ইতিহাস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সহস্রাধিক বছর বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ভাবের আদান-প্রদান করেছে মৌখিক বাংলায়। বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছে বলেই আঠারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না।

সাহিত্যের বাহন না হলেও প্রাত্যহিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই মধ্যযুগের বাংলাদেশে লিখিত গদ্যভাষার প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক চিঠিপত্রে এবং দলিল-দস্তাবেজে আদি গদ্যের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বিশৃঙ্খল এই গদ্যভাষার জন্ম মধ্যযুগের সময় পরিসরে হলেও, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব হয়েছে আধুনিক যুগে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে।

উনিশ শতকে বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বিদেশিরা। আঠারো শতকের শেষে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারি এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। উইলিয়াম কেরী এবং টমাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এঁরাই ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ মিশন থেকে বাংলা গদ্যে বাইবেল-এর অনুবাদ এবং ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। এ-সময়ই ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। উইলিয়াম কেরী এক্ষেত্রেও পালন করেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যে-সব সিভিলিয়ান কর্মচারী এদেশে আসতেন তারা দেশীয় ভাষা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করার স্বার্থেই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি। তাঁরই উদ্যোগে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। অন্যান্য দেশীয়-ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভব করেই কলেজটিতে শুরুর পরের বছরই (১৮০১) বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উইলিয়াম কেরী হন বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। তিনি নিজে বাংলা গদ্যে দুটি বই রচনা করলেন এবং দেশীয় শিক্ষক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়েও কিছু পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করালেন।

বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি থেকে মুক্ত করার কৃতিত্ব যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়-এর (১৭৭৪-১৮৩৩)। উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগ ও চর্চায় বাংলা গদ্য ঐ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে প্রাণবন্ত তর্ক বিতর্কের লিখিত গদ্যরূপ বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। এভাবেই বাংলা গদ্য বিকাশধারার পথ খুঁজে পায়। রামমোহন রায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : *বেদান্ত গ্রন্থ* (১৮১৫), *বেদান্ত সার* (১৮১৫), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮), *সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ* (১৮১৮-১৯)। রামমোহনের সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন *কলিকাতা কমলালয়*, *নববাবু বিলাস*, *নববিবি বিলাস* গ্রন্থের রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)।

আলোচনা বিতর্ক ও মীমাংসা এবং ধর্মতত্ত্বের বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের অমিত সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামমোহন রায়। আর এ গদ্যকে সাহিত্যের বাহনের মর্যাদায় উন্নীত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। ভাব ও বিষয় অনুসারে বাক্যবিন্যাস এবং ইংরেজি ভাষার আদলে বিভিন্ন বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করেছেন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী অভিধায়। তবে বিদ্যাসাগর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি প্রধানত অনুবাদক, পাঠ্যগ্রন্থ প্রণেতা এবং শিক্ষা-সমাজ সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধকার। তাঁর অনূদিত, রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *ভ্রান্তি বিলাস* (১৮৬৯), *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৮৪৮), *সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৩), *বিদ্যাসাগর চরিত* (১৮৯১), *আত্মচরিত* (১৮৯২) ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক এবং লেখক হিসেবে পূর্বে আবির্ভূত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গদ্য রচয়িতা। 'বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির' চর্চাকারী হিসেবে বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমারের অবদান সুচিহ্নিত। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও যে বাংলা গদ্যের বাহন হতে পারে, সে সম্ভাবনা আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁর। অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : *ভূগোল* (১৮৪১), *চারুপাঠ* (তিনখণ্ড, ১৮৫৩-৫৯), *পদার্থবিদ্যা* (১৮৫৬), *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার*

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ; ১৮৫১, ১৮৫৩), *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল *ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ* (১৮৫০), *আত্মতত্ত্ববিদ্যা*(১৮৫২), *জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি* (১৮৯৩)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা ঘটে বাংলা সাহিত্যে। এ সময় থেকেই বাংলা গদ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল গদ্য সাহিত্য রচনার সূত্রপাতও হয় এ সময়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে সৃষ্টিশীল গদ্য রচয়িতা হিসেবে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩৯-৭৩)। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেশ কটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কথিকাধর্মী রচনা *ঐতিহাসিক উপন্যাস* (১৭৭৯ শকাব্দ) বিশেষ তাৎপর্যে চিহ্নিত। এ গ্রন্থের দুই কাহিনী *সফল স্বপ্ন* ও *অঙ্গুরীয় বিনিময়*কে কোনো কোনো সমালোচক প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাংলা উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) গ্রন্থে। *আলালের ঘরে দুলালের* গুরুত্ব শুধু উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত প্রথম রচনা হিসেবে নয় বরং বাংলা গদ্যের পালাবদলের মাইল ফলক হিসেবেই এর সমধিক গুরুত্ব। প্যারীচাঁদ মিত্র *আলালের ঘরের দুলাল*-এ ব্যবহার করলেন কলকাতার চলতি বুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা। এর মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কথ্যবুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালী ভাষা' তাই এক স্মরণীয় মাইল ফলক। 'আলালী ভাষা' আলোচনায় 'হুতোমী ভাষা'র প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) রচিত *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা*ও (১৮৬২-৬৪) কলকাতার চলতি বুলিতে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালীপ্রসন্নের পূর্বে বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিত ভাষারীতির ব্যবধান সুচিহ্নিত ছিল না। তাঁর অনূদিত *মহাভারতে* এবং *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়* ক্লাসিক সাধুভাষা ও অপভাষা মিশ্রিত চলিত বুলির ব্যবধানটি মোটা দাগে চিহ্নিত ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দশক বাংলা গদ্যে মৌলিক নাট্যসাহিত্য রচনার কারণেও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। স্মরণীয়, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকার পরিচয়ে। তাঁর রচিত *কৃষ্ণকুমারী নাটক* বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। মধুসূদনের অন্যান্য নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা* (১৮৬০) ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)। তাঁর নাট্যচর্চায় সম্প্রসারিত হল বাংলা গদ্যের সম্ভাবনা। বাংলা গদ্য যে সার্থক নাটকের, বিশেষত গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণ প্রহসনের বাহন হতে পারে, মধুসূদনের নাটক তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

পাঠ্যপুস্তক ও তর্ক-বিতর্কের বাহন হিসেবে প্রচলিত যে গদ্য বিদ্যাসাগরের চর্চায় শিল্প মাধ্যমের স্তরে উন্নীত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৮-৯৪) সাধনায় সে গদ্য শিল্পিত উপন্যাসের ধারক হয়ে উঠল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গদ্যে, যুগপৎভাবে উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যরচনায় বাংলা গদ্যের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য সুপ্রমাণিত হল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিম গদ্যচর্চার নতুন যে পথসন্ধান দিলেন, তাকে অনুসরণ করেই সৃষ্টিশীল গদ্যসাহিত্য উত্তরকালে বিকশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* ((১৮৮৪), *বিবিধ প্রবন্ধ* (১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ ১৮৯২)।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) এ যুগের একজন বলিষ্ঠ গদ্যলেখক। *বিষাদসিন্ধু* (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১) তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। লেখকের অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের নাম *উদাসীন পথিকের মনের কথা* (১৮৯০), *গাজী মিয়ার বস্তানী* (১৮৯৯)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য সাধনার বিস্তার ও সমৃদ্ধি বিশ শতকে। আর বিশ শতকের প্রথমার্ধকে অভিহিত করা হয় 'রবীন্দ্রযুগ' নামে। স্মরণীয়, উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষত 'গল্পগুচ্ছের' শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর বেশ কটি রচিত হয় এ-সময়ে। তবে গদ্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের শিখরস্পর্শী সাফল্য ঘটেছে বিশ শতকেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পালাবদল ঘটে। এ সময় থেকে তিনি সাধুভাষা রীতির গদ্য পরিত্যাগ করে চলিত ভাষারীতির গদ্য গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু গদ্যচর্চায় ঐ রীতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চায় বিকাশমান বাংলা গদ্যভাষা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। মানুষের বহুমুখী আবেগ অনুভূতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন তাঁর সৃজনশীল চর্চায় বাংলা গদ্যের বাহন হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের যে সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তা বিচিত্রমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নিজের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলা গদ্যের 'মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য'। রবীন্দ্রনাথের বিপুল গদ্যসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : **নাটক–** *অচলায়তন* (১৯১২), *ডাকঘর* (১৯১২), *রক্তকরবী* (১৯১৬), *মুক্তধারা* (১৯২৫), **উপন্যাস–** *চোখের বালি* (১৯০৩), *গোরা* (১৯০৮), *চতুরঙ্গ* (১৯১৫), *ঘরে বাইরে* (১৯১৫), *যোগাযোগ* (১৯২৯), *শেষের কবিতা* (১৯২৯)। **ছোটগল্প–** *গল্পগুচ্ছ* (তিনখণ্ড), *সে* (১৯৩৭), *তিনসঙ্গী* (১৯৪১)। **প্রবন্ধ–** *সভ্যতার সংকট* (১৯৪১)। **সাহিত্য সমালোচনা–** *প্রাচীন সাহিত্য* (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), *আধুনিক সাহিত্য* (১৯০৭)। **রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ–** *স্বদেশ* (১৯০৮) *শিক্ষা* (১৯০৮), *কালান্তর* (১৯৩৭)। **ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক**

**গ্রন্থ–** *ধর্ম* (১৯০৯), *শান্তি নিকেতন* (১৯০৯-১৬), *মানুষের ধর্ম* (১৯১৩)। ***ব্যক্তিগত প্রবন্ধ–*** *পঞ্চভূত* (১৯০৭), *বিচিত্র প্রবন্ধ* (১৯০৭), *ছিন্নপত্র* (১৯১২), *জীবনস্মৃতি* (১৯১২) *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩১), *ছেলেবেলা* (১৯৪০)।

রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হয়েও যিনি রবীন্দ্রগদ্য দ্বারা প্রভাবিত হননি এবং রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। তাঁর লেখক ছদ্মনাম 'বীরবল'। নতুন গদ্যরীতির প্রবক্তা হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গদ্য 'বীরবলী গদ্য' নামে পরিচিত। তাঁর আর এক অসামান্য কীর্তি *সবুজপত্র* নামের সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা। তিনিই প্রথম কলকাতার প্রমিত চলিত ভাষায় গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সম্পাদিত *সবুজপত্র* পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষারীতির গদ্য লেখা শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- *বীরবলের হালখাতা*, *নানা কথা* (১৯১৯), *রায়তের কথা*, *গল্পসংগ্রহ*।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলা গদ্য উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছালেও কোটি কোটি বাঙালির জীবন্ত ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা আজও বিকাশমান। রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা গদ্যচর্চায় যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন, সেসব সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যিক ও মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও কৃতিত্বের পরিচয় নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল :

| লেখকের নাম | গ্রন্থের নাম |
|---|---|
| ১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) | *প্রকৃতি (১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), বিচিত্র জগৎ (১৯২০)।* |
| ২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) | *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪৯), ঘরোয়া (১৩৪৮)।* |
| ৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮) | *পল্লীসমাজ (১৯১৪), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০)।* |
| ৪. রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) | *গড্ডলিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭)।* |
| ৫. মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) | *আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কবি শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিম-বরণ।* |
| ৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায় (১৮৯৪-১৯৫০) | *পথের পাঁচালী (১৯২৯), আরণ্যক (১৩৪৫), ইছামতী (১৩৫৬)।* |
| ৭. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) | *শাশ্বত বঙ্গ (১৩৫৮), কবিগুরু গ্যেটে (২ খণ্ড), বাংলার জাগরণ (১৯৫৬), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬)।* |
| ৮. আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) | *আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানী পর্দা, গালিভারের সফরনামা, জীবন ক্ষুধা, আবেহায়াত, সত্যমিথ্যা, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এবং আত্মকথা।* |
| ৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) | *গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), কবি (১৯৪২), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)* |
| ১০. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) | *বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), ব্যথার দান (১৯২২), যুগবাণী (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রী* |
| ১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৫৭) | *স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ।* |
| ১২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) | *সংস্কৃতি-কথা (১৩৬৫)।* |
| ১৩. সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪) | *দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, শবনম।* |
| ১৪. আবুল ফজল (১৯০৫-১৯৮১) | *রাঙা প্রভাত (১৯২৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬০), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, শুভবুদ্ধি, সমকালীন চিন্তা।* |
| ১৫. হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) | *বাংলার কাব্য (১৯৪২)।* |
| ১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) | *পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), চিহ্ন (১৯৪৭)।* |
| ১৭. বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) | *কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, মহাভারতের কথা, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আমার যৌবন, আমার ছেলেবেলা।* |
| ১৮. বিনয় ঘোষ (১৯১৭-৮০) | *বাংলার নবজাগৃতি, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।* |
| ১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১) | *নয়নচারা, লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।* |
| ২০. মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) | *কবর, মীরমানস, বাংলা গদ্যরীতি, তুলনামূলক সমালোচনা।* |

# বিড়াল

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## লেখক-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাছাকাছি কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন জন্মগ্রহণ করেন। হুগলি মোহসিন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। কর্মজীবনে তিনি প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং এ-পদে ৩৩ বছর চাকরি করে ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একজন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫২ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি উপন্যাস *Rajmohan`s wife*। মোগল-পাঠান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের প্রেমকে উপজীব্য করে ১৮৬৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম শিল্পসম্মত সার্থক উপন্যাস। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতঘেঁষা সাধুরীতির বাংলায় যেটুকু জড়তা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা দূর হলো– বাংলা হয়ে উঠল সাহিত্যের উপযোগী ভাষা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উৎকৃষ্টমানের প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর অন্যতম কীর্তি *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'সাহিত্যসম্রাট' হিসেবে অধিক পরিচিত। এই কীর্তিমান পুরুষ ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪।

**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম :**

**উপন্যাস** : *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *রাজসিংহ* (১৮৮২);

**রম্যরচনা** : *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫);

**প্রবন্ধ** : *লোকরহস্য* (১৮৭৪), *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭ ও ১৮৯২), *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬)।

## ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিড়াল' একটি আকর্ষণীয় রম্যরচনা। প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। রূপকের মাধ্যমে লেখক আমাদের সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের প্রতি ধনী সমাজের প্রভাবের কথা তুলে ধরেছেন। সমাজে শৃঙ্খলা আনতে হলে মানুষকে যে বিচারবুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে এবং বৈষম্য দূর করতে হলে যে মানুষকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে তা লেখক সুস্পষ্টভাবে প্রবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন।

## সাধারণ উদ্দেশ্য

**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিড়াল' প্রবন্ধটি পাঠের পর আপনি–**

- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যরচনার গুণ, মান ও রসবোধের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।
- সাধুরীতির গদ্য যে কতো সহজ এবং আকর্ষণীয় হতে পারে তা বুঝতে পারবেন।

# পাঠ-১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- কিছু ঐতিহাসিক নাম ও স্থান সম্বন্ধে লিখতে পারবেন।
- বিড়াল কোন সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কী বলছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

আমি শয়ন গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে– দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই– এ জন্য হুকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটু ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম– হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি– এখন বল কী?"

বলি কী? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কী জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে– আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল– অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী– আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অনুসন্ধান**– খোঁজ। **অপরিমিত**– পরিমাণ করা হয়নি যার। **অবমাননা**– অপমান। **অভিপ্রায়**– ইচ্ছা। **আইস**– আসো। **আফিঙ্গ**– আফিম বা অহিফেন। পোস্ত বীজ থেকে তৈরি ওষুধ ও মাদকদ্রব্য। **আহরিত**– সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। **উদরসাৎ**– খেয়ে ফেলা। **এক্ষণে**– এখন। **ওয়াটার্লু**– যুদ্ধক্ষেত্রের নাম। নেপোলিয়ন এখানে ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন। **ওয়েলিংটন**– ডিউক অব ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫৪ খ্রি.) নামে সমধিক পরিচিত। ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইনি মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। **কাপুরুষ**– ভীতু পুরুষ। **ক্ষুৎপিপাসা**– ক্ষুধা ও পিপাসা। **চতুষ্পদ**– চার পেয়ে প্রাণী। **চারপায়ী**– টুল বা চৌকি। **চিরাগত**– প্রথা, বহুদিন ধরে যা চলে আসছে। **ঠেঙ্গালাঠি**– লম্বা লাঠি। **ডিউক মহাশয়**– ক্ষুদ্র রাজা, অভিজাত ব্যক্তি। **দিব্যকর্ণ**– অলৌকিক ক্ষমতায় শোনার কান। **ধাবমান হইলাম**– ধেয়ে গেলাম। **নিমীলিত লোচনে**– বন্ধ চোখে। **নিঃশেষ**– একেবারে শেষ। **নেপোলিয়ন**– পূর্ণনাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) মহাবীর ফরাসি সম্রাট। প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন। ১৮১৫ খ্রি. ওয়াটার্লু যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাজিত হন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। **পুনরপি**– আবার। **পাষাণবৎ**– পাথরের মতো **প্রকটিত**– প্রকাশ। **প্রভেদ**– পার্থক্য। **প্রেতবৎ**– প্রেতের মতো। **প্রহার**– শরীরে আঘাত। **বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া**– বিড়াল হয়ে। **বাঞ্ছনীয়**– যা চাওয়া যায় এমন। **বিজ্ঞ**– জ্ঞানী। **ব্যতীত**– ছাড়া। **ব্যূহ রচনা**– যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো। **মনুষ্য**– মানুষ। **মার্জার**– বিড়াল। **মূলীভূত**– আসল, গোড়ার। **যথোচিত**– যেমন উচিত। **শয়নগৃহ**– শোয়ার ঘর। **শয্যায়**– বিছানায়। **শাস্ত্রানুসারে**– নিয়ম অনুসারে। **ষষ্ঠি**– লাঠি। **সকাতর চিত্তে**– কাতর মনে। **সগর্বে**– অহঙ্কারের সঙ্গে। **সহায়**– সহকারী।

## সারসংক্ষেপ

লেখক এখানে নিজেই কমলাকান্ত। চরিত্রটির মুখ দিয়ে বস্তুত লেখক নিজেই তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। বিড়াল নিরীহ প্রাণী। সুযোগ পেলেই দুধ চুরি করে খায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে ব্যবধান তা যে মানুষেরই সৃষ্টি এ কথাই লেখক কমলাকান্ত সেজে বলেছেন। তাঁর মতে যারা দরিদ্র অসহায় তারা অনেক সময় বাধ্য হয়ে অন্যায় করে। তখন ধনীরা তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। কেন তারা অন্যায় করল তার কারণ কখনো খোঁজা হয় না। বিড়ালকে দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে। কমলাকান্তের সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে রূপকের আশ্রয়ে। আজ সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে পার্থক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ী ধনী মানুষগুলোই। সুতরাং এহেন কাজের জন্য দরিদ্র শ্রেণির মানুষকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. কে চিরায়ত প্রথা অবমাননা করতে চায়নি?**

ক. কমলাকান্ত　　খ. মার্জার
গ. নসীরাম　　ঘ. প্রসন্ন

**২. কমলাকান্ত 'পাষাণবৎ কঠিন' হয়েছিল কেন?**

ক. লর্ড ওয়েলিংটন আফিং চাওয়ায়　　খ. বিড়ালকে সগর্বে তাড়াতে
গ. প্রসন্ন টাকা চাওয়ায়　　ঘ. মঙ্গলার কষ্টে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

অথৈ ঘরের খাবার বেঁচে গেলে নর্দমায় ফেলে দেয়। কিন্তু তার প্রতিবেশী হাসনা বানু পর্যাপ্ত আয় করতে পারে না বলে প্রায়ই অনাহারে থাকে।

**৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোন রচনার মিল রয়েছে?**

ক. বিড়াল　　খ. অপরিচিতা
গ. বিলাসী　　ঘ. আমার পথ

**৪. উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–**

ক. ধনীর বৈশিষ্ট্য　　খ. দরিদ্রের বৈশিষ্ট্য
গ. ধনী-দরিদ্র বৈষম্য　　ঘ. ধনী-দরিদ্র সমঝোতা

## পাঠ-২

### পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- বিড়ালের মতো অসহায় প্রাণীরা তাদের অপরাধের জন্য কী কী যুক্তি দেখায় তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিড়াল কী কী বলেছে তার সার কথাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

### মূলপাঠ

"দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে– চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?"

"দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে, তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না– সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?"

"দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা ত নয়– তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ– দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর– আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর– ছি! ছি!"

"দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি– কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল– গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল– তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।"

"আর আমাদিগের দশা দেখ– আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে– জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে– অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!–" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া

ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড নাই কেন? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অধীর**– অধৈর্য। **অসীম**– যার সীমা নেই। **উপবাস**– না খেয়ে থাকা। **কস্মিনকালে**– কোনো কালে। **ক্ষুধানুসারে**– কেমন খিদে লাগে তা বিবেচনা করে। **জলযোগ**– হালকা খাবার বা নাশতা। **দণ্ডবিধান**– শাস্তির ব্যবস্থা। **ধর্মাচরণে**– ধর্মের আচার আচরণে। **নিউমান–** একজন বিখ্যাত লেখক। **নির্বিঘ্নে–** নিরাপদে। **নৈয়ায়িক**– যিনি ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **পতিত আত্মা**– দুর্দশায় পড়েছে এমন আত্মা। এখানে কথাটা বিড়ালকে বলা হয়েছে। **পরাস্ত**– পরাজিত। **পাঠার্থে–** পড়ার জন্য। **পুনর্বার**– আবার। **প্রথানুসারে**– নিয়ম অনুসারে। **মহিমা–** গুণ। **মার্জারী মহাশয়া**– স্ত্রী বিড়ালকে সম্বোধনের জন্য মহাশয়-এর সঙ্গে আ-প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। **সুতার্কিক**– তর্কে পটু। **সরিষা ভোর–** সর্ষে দানার সমান। **সোশিয়ালিস্টিক**– এটি ইংরেজি শব্দ। সমাজতান্ত্রিক। সমাজের সবাই সমান– এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ। **স্বস্থানে–** নিজের জায়গায়।

## সারসংক্ষেপ

বিড়াল তার চুরি করে দুধ খাওয়ার কারণ বলতে গিয়ে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অনিয়মের কথা বলেছে। তার ব্যাখ্যায় ধনী কৃপণদের জন্যই গরিবরা চোর হয়। তাই চোরের শাস্তি হলে যারা চোর তৈরি করে, তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত। বিড়াল তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছে যে, মানুষ তেলা মাথায় তেল ঢালে– এটা তাদের সবচেয়ে বড় দোষ। যাদের খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য মানুষ ভোজের আয়োজন করে। আর শুধু বেঁচে থাকার জন্য যাদের একটু খাবার প্রয়োজন, তাদেরকে কেউ খেতে দেয় না। ভোজের আসরে খেতেও ডাকে না। বরং খাবার বেঁচে গেলে তা ফেলে দেয়া হয়, তবু ক্ষুধার্তদের জন্য রাখা হয় না। ধনীদের এমন নির্দয় আচরণের জন্যই দরিদ্র অসহায়রা চুরি করে। তাই চুরির জন্য দরিদ্রকে শাস্তি দেয়ার কোনো অধিকার নেই ধনীর। বিড়াল বলতে চায় যে, কৃপণ ধনীরাই চোর সৃষ্টি করে। কারণ তারাই ক্ষুধার্তকে চুরি করতে বাধ্য করে। ধনীরা একাই পাঁচশ জনের সম্পদ ভোগ করে, তবু একটু উচ্ছিষ্ট গরিবদের জন্য রাখে না। এসবই সমাজিক অন্যায়। তাই বিড়ালের মতে, চোরের শাস্তি হলে ধন কুক্ষিগত করার অপরাধে ধনীরও শাস্তি হওয়া উচিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. পৃথিবীতে কিসে বিড়ালের অধিকার রয়েছে?**

ক. দুধে-আফিঙে　　খ. মৎস্য-মাংসে
গ. মাংসে-দুধে　　ঘ. ছানা-দুধে

**৬. বিড়াল চোর হয়েছে কেন?**

ক. লোভে পড়ে　　খ. জাতিভেদে
গ. খেতে না পেয়ে　　ঘ. ধনী হবার আশায়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ক্ষুধার তাড়নায় ছেলে রাসু চুরি করেছে। চুরি করার অপরাধে ছেলেকে মারতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো আফাজ আলি।

**৭. উদ্দীপকের আফাজ আলির সঙ্গে 'বিড়াল' গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?**

ক. কৃপণ ধনী　　খ. মার্জারী
গ. কমলাকান্ত　　ঘ. বিড়াল

**৮. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে–**

i. শোষণে
ii. মানবিকতায়
iii. জাতিপ্রথা উচ্ছেদে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

## পাঠ-৩

### পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- ধনীর প্রতিনিধি হিসেবে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী বলতে চেয়েছেন তা বুঝিয়ে লিখতে পারবেন।
- দরিদ্রের দৃষ্টিতে সমাজের উন্নতি বলতে বিড়াল কী বোঝাতে চেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।

### মূলপাঠ

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জার বলিল, "না হইল ত আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মতো এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর

কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে– আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অবিরত**– অনবরত। **অস্থি**– হাড়। **আহ্বান**– ডাকা। **আহার্য**– খাবার। **উদর–** পেট। **কৃশ**– রোগা। **কার্পণ্য**– কৃপণতা। **কৃষ্ণচর্ম–** কালো চামড়া। **কৃপণ**– যে শুধু সঞ্চয় করে খরচ করে না। **ক্ষীণ–** দুর্বল। **তদপেক্ষা**– তার চেয়ে। **দণ্ড**– শাস্তি। **দূরদর্শী**– যার ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা আছে। **নির্দয়**– নিষ্ঠুর, দয়াহীন। **ন্যায়ালঙ্কার**– ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত। **পরিদৃশ্যমান**– দেখা যায় এমন। **প্রাঙ্গণ**– মাঠ। **প্রয়োজনাতীত**– প্রয়োজনের চেয়ে বেশি । **প্রাসাদ**– বিশাল বাড়ি। **বঞ্চিত**– প্রতারিত, যে ঠকেছে এমন। **বিনত**– নম্র। **ভার্যা–** স্ত্রী, বৌ। **ভোজ**– খাওয়া-দাওয়া। **মান্য**– সম্মান পাওয়ার যোগ্য। **যুবতী**– যৌবনবতী মেয়ে। **লাঙ্গুল**– লেজ। **শিরোমণি**– সমাজের প্রধান ব্যক্তি। **শিহরিয়া**– শিউরে ওঠা। **শুষ্ক মুখ–** শুকনো মুখ। **সকরুণ**– অতি দুঃখপূর্ণ। **সতরঞ্চ খেলা**– দাবা খেলা। **সহোদর**– একই উদরে জন্ম অর্থাৎ আপন ভাই।

## সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞ বিড়ালের কথায় সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করে কমলাকান্ত কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। যে মতবাদে ধনী এবং নির্ধন সমান। কমলাকান্তের যুক্তি হলো ধনী যদি ধন সঞ্চয় না করে তাহলে সমাজের উন্নতি হবে না। আর বিড়াল মনে করে নির্ধন যদি খেতেই না পায় তাহলে সমাজের উন্নতিতে তার লাভ কী? বিড়ালের মতে, চোরকে শাস্তি দেয়ার আগে একটা নিয়ম করা প্রয়োজন। সেটা হলো, বিচারককে তিন দিন না খেয়ে থাকতে হবে। তখন যদি বিচারকের চুরি করে খেতে ইচ্ছে না করে, তবেই তিনি চোরকে শাস্তি দিতে পারবেন। কমলাকান্ত বিড়ালের সঙ্গে তর্কে না পেরে উপদেশ দিতে চাইলেন। বিড়ালকে ধর্মকর্মে মন দিতে বললেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কিছু বইও দিতে চাইলেন। অবশেষে খাবারের ভাগ দিবেন বলে তার্কিক বিড়ালকে চলে যেতে বললেন। খুব খিদে পেলে সর্ষে পরিমাণ আফিমও দিতে চাইলেন। আপোসের কথা শুনে একটু খুশি হয়ে বিদায় নিলো বিড়াল। কমলাকান্ত বিড়ালকে জ্ঞান দিতে পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হলেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৯. কমলাকান্ত বিড়ালকে কিসের ভাগ দিতে চেয়েছে?**

ক. ছানা　　খ. জলখাবার
গ. আফিং　　ঘ. দুধ

**১০. কী কারণে চোর অপেক্ষা কৃপণ ধনী শতগুণে দোষী?**

ক. দরিদ্রের ধন চুরি করে　　খ. দরিদ্রকে কিছুই দেয় না
গ. অন্যের সম্পদ লুট করে　　ঘ. সমাজের ধন কুক্ষিগত করে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতিমান। তবে তাঁর এই ব্যঙ্গের পেছনে রয়েছে সাম্যচেতনা, ন্যায়বোধ ও মানবিকতা।

**১১. উদ্দীপকের চেতনা 'বিড়াল' প্রবন্ধে কার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে?**

ক. কমলাকান্ত　　খ. প্রসন্ন গোয়ালিনী
গ. ওয়েলিংটন　　ঘ. বিড়াল

**১২. উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধে সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–**

i. সাম্যচেতনা প্রকাশে
ii. ডিউক মহাশয়ের বক্তব্যে
iii. বিড়ালের দ্রোহে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**১৩. আফিংখোর কে ?**

ক. ওয়েলিংটন　　খ. ডিউক
গ. প্রসন্ন　　ঘ. কমলাকান্ত

**১৪. 'পরোপকার' বলতে বোঝানো হয়েছে–**

ক. মানবধর্ম　　খ. নৈতিক ধর্ম
গ. পরম ধর্ম　　ঘ. চরম ধর্ম

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

রাস্তার পাশে দশতলা একটি অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গা হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের লোকজন প্রস্তুত। এলাকার মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। ওদিকে অপরপাশে রেলের বস্তিটি উচ্ছেদ করার সময় কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

**১৫. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিচের কোন রচনার সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. আমার পথ　　খ. অপরিচিতা
গ. বিড়াল　　ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

**১৬. উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের উপজীব্য–**

ক. ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য　　খ. প্রতিবাদী চেতনা
গ. অন্যায়ের প্রতিরোধ　　ঘ. দরিদ্রের প্রতি মমত্ববোধ

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

বনমালী বাবুর বাড়িতে আজ ভোজের আয়োজন। উপলক্ষ আর কিছুই নয়। তার বড় মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করেছেন। সমাজসেবায় জড়িত থাকার কারণে ছোট নেতারা পর্যন্ত আমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়েনি। আমন্ত্রিত অতিথিরা বিলাস-ব্যসনে সময় কাটিয়ে আনন্দচিত্তে বাড়ি ফেরেন। এর কয়েকদিন পর বনমালী বাবুর বাড়িতে একজন ভিখারি আসে। অভুক্ত ভিখারি ক্ষুধার তাড়নায় বনমালী বাবুর নিকট খাবার খেতে চায়। কিন্তু তিনি ভিখারিকে খাবার না দিয়ে তিরস্কার করেন।

ক. নেপোলিয়ন কে ছিলেন?
খ. 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ'– কেন? বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?– ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

ডাকিল পান্থ, দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন !
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারি ফুকারি কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !

ক. মার্জার শব্দের অর্থ কী?
খ. 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের ভিখারির সঙ্গে 'বিড়াল' প্রবন্ধে কার মিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের একটি সমাজ-সত্য ফুটে উঠেছে।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**
নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন।

**খ.**
'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' বলতে ধনীরা যে শুধু ধনীদেরকেই গুরুত্ব দেয় সে বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।
'বিড়াল' প্রবন্ধে মনুষ্যজাতির একটি রোগ বা বিশেষ প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। এই রোগটি হলো তেলা মাথায় তেল দেয়া। অর্থাৎ যার সম্পদের অভাব নেই তাকে আরও সহযোগিতা করা। সমাজে সাধারণত দেখা যায় ধনী ব্যক্তিরা যদি কখনো ভোজের আয়োজন করেন সেখানে ধনী ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য থাকে। তাদের খাবারের অভাব নেই তবুও তারা অন্য ধনী ব্যক্তির বাড়িতে খাবারের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। কিন্তু যারা ক্ষুধার জ্বালায় মরে তারা কিন্তু এসব ভোজসভায় সহসা নিমন্ত্রণ পায় না। এখানে 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' বলতে সমাজে ধনিক শ্রেণির এই বিশেষ প্রবণতাটিকেই বোঝানো হয়েছে।

**গ.**
উদ্দীপকে বনমালী বাবুর আচরণে অমানবিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

সমাজে ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্রদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা বিলাসী জীবন যাপন করে। দরিদ্ররা যে এ সমাজেরই অংশ তা তারা বিবেচনায় আনতে চায় না। অনেক সময় দেখা যায় দরিদ্রদের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের অর্থে ধনীরা আরাম আয়েশ করে। ধনীরা মুখে নীতিকথা শোনায়, সুযোগ পেলে ধর্মের বুলি আওড়ায়। কিন্তু দরিদ্রদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সমাজের উন্নতির নামে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে।

উদ্দীপকে বনমালী বাবু একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি কন্যার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ–৫ প্রাপ্তি উপলক্ষে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করান। তার আমন্ত্রণ থেকে ছোট-খাট নেতারাও বাদ পড়ে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে বাড়িতে একজন ভিখারি এলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। বনমালী বাবু সমাজের প্রভাবশালীদের আমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন, কিন্তু যে অভুক্ত ও দরিদ্র সে অন্ন ভোগ করতে পারেনি। উদ্দীপকে বনমালী বাবু উপলব্ধি করেননি যে দরিদ্ররাও মানুষ, তাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা আছে। বনমালী বাবুর এ ধরণের আচরণ যেমন অমানবিক তেমনি তা অনৈতিকও বটে। অন্যদিকে 'বিড়াল' প্রবন্ধেও দেখা যায়, বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনে দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের এই অবহেলার স্বরূপটি ফুটে ওঠেছে। বলা যায়, বিড়াল প্রবন্ধে ধনীদের অমানবিক আচরণের বিষয়টি উদ্দীপকের বনমালী বাবুর আচরণে প্রকাশিত হয়েছে।

**ঘ.**
'বিড়াল' প্রবন্ধের শ্রেণি-বৈষম্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে যা চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

যে সমাজ শ্রেণি চরিত্রকে ধারণ করে সেখানে ধনিক শ্রেণি দরিদ্রদের শোষণ করে অর্থ সঞ্চয় করে। সমাজের উন্নতির কথা বলে তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। এই ধনিক শ্রেণিটি মুখে ধর্মের কথা শোনায়, আদর্শের কথাও বলে। তাদের এ ধরনের মানসিকতার কারণে সমাজে দরিদ্ররা আরও নিঃস্ব হয়। একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে এটা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি বনমালী বাবু তার কন্যার জিপিএ–৫ প্রাপ্তি উপলক্ষে বাড়িতে ভোজের আয়োজন করেছেন। সেখানে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছোট নেতারা পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু এই ভোজ অনুষ্ঠানে দরিদ্রদের আহারের কোনো সুযোগ নেই, অথচ তারা অভুক্ত। বনমালী বাবু এই ভোজ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পর তার বাড়িতে আসা একজন ভিখারীকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে 'বিড়াল' প্রবন্ধে দেখি বিড়াল শোষিত শ্রেণি ও কমলাকান্ত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনে উঠে এসেছে ধনীরা কীভাবে দরিদ্রদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে। সমাজে দরিদ্রদের প্রতিবাদে কোন কাজ হয় না। বরং তারা যেন শোষক শ্রেণির যাঁতাকলে নিয়ত চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। বস্তুত 'বিড়াল' প্রবন্ধে কমলাকান্ত ও বিড়ালের আলোচনায় এই চিরকালীন সমাজ সত্যটিই ফুটে উঠেছে।

'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়াল দরিদ্র শ্রেণি এবং কমলাকান্ত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। উদ্দীপকের বনমালী চরিত্রেও ধনিক শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উভয়টিতে দেখা যায় দরিদ্ররা বরাবরই শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। মানুষকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ধনীরা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থেকেছে। দরিদ্রদের বাঁচার অধিকারটুকুকেও এই ধনিক শ্রেণি স্বীকৃতি দেয় না। যদিও এ শোষণ ও নিপীড়ন একটি মানবিক সমাজ গঠনের পক্ষে বেশ অন্তরায়। সবশেষে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধ চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিয়া একটি রহস্যময় চরিত্র। উপন্যাসে সে একটি দ্বীপের মালিক, যার নাম ময়না দ্বীপ। ময়না দ্বীপে হোসেন মিয়া সকল শ্রেণির মানুষের আবাস গড়তে চায়। সে স্বপ্ন দেখে এখানে কোনো ধর্মীয় ভেদ থাকবে না, কোনো অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হবে না। এখানকার সকল মানুষ সমাজে সম অধিকারে বসবাস করবে। এখানে এমন একটি স্বপ্নের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে সকল সময়ে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে।

ক. কার দোষে দরিদ্ররা চোর হয়?

খ. 'খাইতে দাও, নহিলে চুরি করিব।' –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিড়াল' রচনাটির মিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "হোসেন মিয়ার ভাবনাই 'বিড়াল' রচনাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।" –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ঘ
১৩. ক ১৪. গ ১৫. গ ১৬. ক

# অপরিচিতা

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

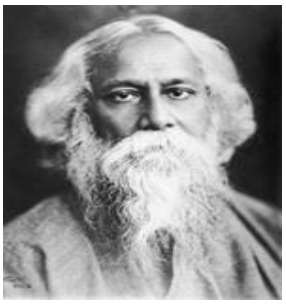

## লেখক-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মা'র চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বনফুল*। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁর হাতেই সম্পন্ন হয় বাংলা ছোটগল্পের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা। মাত্র ষোল বছর বয়সে 'ভিখারিনী' গল্প রচনার মধ্য দিয়ে ছোটগল্প-লেখক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে মোট ১১৯টি ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর সর্বশেষ গল্পটির নাম 'মুসলমানির গল্প'। গল্পরচনায় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও বিশেষ করে শিলাইদহ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এজন্য তাঁর গল্পে প্রকৃতি একটি বিশেষ চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গীতিময়তা তাঁর গল্পের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়'। এটিই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *গীতাঞ্জলি* (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারি তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্য সাধারণ। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। **তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :**

**কাব্যগ্রন্থ** : *মানসী* (১৮৯০), *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬), *ক্ষণিকা* (১৯০০), *গীতাঞ্জলি* (১৯১১) *বলাকা* (১৯১৬), *পুনশ্চ* (১৯৩২), জন্মদিনে (১৯৪১), *শেষলেখা* (১৯৪১);

**উপন্যাস** : *চোখের বালি* (১৯০৩), *গোরা* (১৯১০), *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬), *শেষের কবিতা* (১৯২৯);

**ছোটগল্প** : *গল্পগুচ্ছ* (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯২৬, ৩য় খণ্ড-১৯২৭), *তিনসঙ্গী* (১৯৪১), *গল্পসল্প* (১৯৪১);

**নাটক** : *বিসর্জন* (১৮৯০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *অচলায়তন* (১৯১২), *ডাকঘর* (১৯১২), *রক্তকরবী* (১৯২৬);

**প্রবন্ধ** : *আধুনিক সাহিত্য* (১৯০৭), *কালান্তর* (১৯৩৭), *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪৩);

**আত্মজীবনী** : *জীবন স্মৃতি* (১৯১২), *ছেলেবেলা* (১৯৪০)।

## ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্প 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি তৎকালীন উচ্চ সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা-বিষয়ক একটি গল্প। গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্র গল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এটি একটি প্রতিবাদী গল্প। অন্যদিকে, গল্পকার এখানে নারীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ব্যাখ্যা করেছেন।

## সাধারণ উদ্দেশ্য

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' গল্পটি পড়ার পর আপনি–**

- রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

# পাঠ-১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ব্যক্তিত্বহীন অনুপমের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে শম্ভুনাথ বাবুর প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।

## মূলপাঠ

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ– বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে– বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া

আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই– থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল– আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে–"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই– বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন– কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্‌ততো ভাই। তাহার মতো রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

## ২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল– ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না– কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হ্যাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ– ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদমশুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই। –সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন– বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন– দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাকরাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা– হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়– যেমন মোটা তেমনি ভারী।

স্যাকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই– এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি। গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাকরার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন–"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না– এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে–"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অন্তঃপুর–** অন্দরমহল, ভেতরবাড়ি। **অন্নপূর্ণা–** অন্নে পরিপূর্ণা, দেবী দুর্গা। **অবকাশের মরুভূমি এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল–** লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তাঁর প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল। **অভিষিক্ত–** অভিষেক করা হয়েছে এমন। **'আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।'–** দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। মা দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ। **আন্ডামান দ্বীপ–** ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আন্ডামান বা আন্দামানে পাঠানো হতো। **উমেদারি–** প্রার্থনা, চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া। **'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে'–** গল্পের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। **কষ্টিপাথর–** যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্ব যাচাই পরীক্ষা করা হয়। **কন্সর্ট–** নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান। **কোন্নগর–** কলকাতার নিকটস্থ একটি স্থান। **গজানন–** গজ আনন যার, গণেশ। **গণ্ডূষ–** একমুখ বা এককোষ জল। **গুড়গুড়ি–** আলবোলা, দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ। **তরুমর্মর–** গাছের শুকনা পাতার মরমর ধ্বনি। **দক্ষযজ্ঞ–** প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এখানে প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোঝাচ্ছে। **দেওয়া-থোওয়া–** বিয়ের যৌতুক ও আনুষঙ্গিক খরচ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে। **পশ্চিমে–** এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। **পঞ্চশর–** মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ। **প্রজাপতি–** জীবের স্রষ্টা, ব্রহ্মা, বিয়ের দেবতা। **ফগুফল্গু–** ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত। **ফলের মতো গুটি–** গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা। **'ফল্গু বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।'–** অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। **'বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম'–** অনুপম নিজের বিবাহযাত্রার পরিস্থিতি বর্ণনায় সুরশূন্য বিকট কোলাহলের সঙ্গে সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত হওয়ার তুলনা করেছে। **বাঁধা হুঁকা–** সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ। **বিদ্রূপ–** পরিহাস, ঠাট্টা। **বিমর্ষ–** বিষণ্ন, মনমরা। **মকরমুখো–** মকর বা কুমিরের মুখের অনুরূপ। **মকরমুখো মোটা একখানা বালা–** মকরের মুখাকৃতিযুক্ত হাতে পরিধেয় অলঙ্কারবিশেষ। **মনু–** বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। **মনু সংহিতা–** মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ। **মহানির্বাণ–** সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি। **মরীচিকা–** বৃথা আশার ছলনা। **মহার্ঘ–** মহামূল্যবান। **মাকাল ফল–** দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে

গুণহীন। **লগ্ন–** উপযুক্ত বা শুভ সময়। **লোক-বিদায়–** পাওনা পরিশোধ। এখানে অনুষ্ঠানের শেষে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। **সওগাদ–** উপঢৌকন, ভেট। **স্বয়ংবরা–** যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে। **স্ফুলিঙ্গ–** আগুনের ফুলকি বা কণা। **হিতৈষী–** মঙ্গল করতে ইচ্ছুক।

## সারসংক্ষেপ

যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের গল্প 'অপরিচিতা'– ব্যক্তিত্বহীন এক যুবক অনুপমের জবানিতে লেখা। গল্পে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কল্যাণী ও তার পিতা শম্ভুনাথ সেনের চারিত্রিক দৃঢ়তার ফলে সমাজে গেড়ে বসা ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। অনুপমের বয়স যখন অল্প, তার বাবা ওকালতি করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েও ভোগ করার আগেই মারা যান। পিতৃহারা পুত্রকে তার মা এতটুকু কষ্ট করতে দেননি, ফলে সাধারণ ঘরের ছেলেদের মতো অনুপমের মানসিক বয়োবৃদ্ধি ঘটেনি। তার মামাই এখন অভিভাবক হয়ে সমস্ত সংসারটিকে কুক্ষিগত করেছেন। আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও শম্ভুনাথ বাবুর একমাত্র মেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে অনুপমের বিয়ের প্রস্তাব এলে তার মামা রাজী হয়ে যান। বিয়ের দিন মামা আকস্মিকভাবেই কন্যাপক্ষের দেওয়া সমস্ত গহনা যাচাই করতে চাইলে শম্ভুনাথ বাবু বিস্মিত ও মনঃক্ষুণ্ন হন। তিনি কল্যাণীকে আর অনুপমের হাতে সমর্পণ না করেই অতিথিদের যথারীতি আপ্যায়ন করিয়ে বিদায় দিলেন। বিয়েটা এভাবেই ভেঙে গেল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. কোন অঞ্চল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পলেখাকে প্রভাবিত করেছিল?**

ক. কোন্নগর　　খ. শিলাইদহ
গ. কানপুর　　ঘ. জোড়াসাঁকো

**২. স্বয়ংবরা বলতে বোঝায়–**

i. যে মেয়ে নিজে স্বামী নির্বাচন করে
ii. যে মেয়ের মামা স্বামী নির্বাচন করে
iii. যে মেয়ের পিতা স্বামী নির্বাচন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

রবীন্দ্র ছোটগল্পকে এক দিক থেকে বাঙালির জীবনভাষ্য বলা চলে। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ ঘটেছে, তেমনি একইসঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

**৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন রচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?**

ক. অপরিচিতা　　খ. আমার পথ
গ. বিলাসী　　ঘ. চাষার দুক্ষু

**৪. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে মিল রয়েছে যে বিষয়ে–**

i. বন্ধন থেকে মুক্তিতে
ii. পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতায়
iii. নারীর প্রশস্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

# পাঠ-২

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কল্যাণী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে নারীশিক্ষা জোরদারে কল্যাণীর সামাজিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, "দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।" কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড় সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, "বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল– পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।"

'বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল– এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি– কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা– এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না– এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, "আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।" হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।" মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, "কই কিছুই তো হয়নি বাবা।" বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, "বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।" কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, "যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও– আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।" তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল– এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

**৪**

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকার মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত– আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচের সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছি।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।" মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটি শ্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, "এমন তো আর শুনি নাই।"

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি– চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া– "গাড়িতে জায়গা আছে।" আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে– শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট– মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্লাটফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না– এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া– "জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল– গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে– কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে– তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক– রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাৎ কিছুমাত্র ছিল না– ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই– তাহারই কোনো-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া– আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়াছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু–"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।"

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত-স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা–"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে– সে যেন কোন ওপারের বাঁশি– আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল– সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল "জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা– জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই– আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অনির্বচনীয়–** যা বর্ণনা করা যায় না, বর্ণনাতীত। **অভ্র–** এক ধরনের খনিজ ধাতু। **অভ্রের ঝাড়–** অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি। **একচক্ষু লণ্ঠন–** একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধরনের লণ্ঠন, যা রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। **একপত্তন–** একপ্রস্ত। **কলি–** পুরাণে বর্ণিত শেষ যুগ, কলিযুগ, কলিকাল। **কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল!–** কলিকাল পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল। **কানপুর–** ভারতের একটি শহর। **ক্রোশ–** এক ক্রোশ দুই মাইলের সমান। **'গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল।'–** চলন্ত রেলগাড়ির অবিরাম ধাতব ধ্বনি বোঝানো হয়েছে। **জড়িমা–** আড়ষ্টতা, জড়ত্ব। **'তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।'–** কল্যাণী যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, অনুপমের এই আত্মোপলব্ধি এখানে প্রকাশিত। **ধুয়া–** গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে। **পাকযন্ত্র–** পাকস্থলী। **প্রদোষ–** সন্ধ্যা। **মঞ্জরী–** কিশলয়যুক্ত কচি ডাল, মুকুল। **মৃদঙ্গ–** মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। **রসনচৌকি–** সানাই, ঢোল ও কাঁসি– এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতান বাদন।

## সারসংক্ষেপ

অনেকদিন পর অনুপম তার মা'কে নিয়ে তীর্থে চলেছে। হঠাৎ কোনো এক অজানা স্টেশনে এক অপিরিচিতা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে সে মুগ্ধ হয়। তার ভাষায়– "মনে হইল যেন গান শুনিলাম।" পরদিন একটি বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করার সময় ঐ মেয়েটি অনুপম ও তার মা'কে ডেকে নিয়ে তাদের কামরায় বসতে দেয়। গাড়ি যখন কানপুরে এসে থামে, মেয়েটি তখন জিনিসপত্র গুছিয়ে নামার জন্য প্রস্তুতি নেয়। অনুপমের মা এ সময় তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, তার নাম কল্যাণী ও বাবার নাম শম্ভুনাথ সেন। শুনে মা ও অনুপম দুজনেই চমকে ওঠে। অনুপম পরে জানতে পারে চার বছর আগে তার সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যাবার পর সে আর বিয়ে করেনি। এর অন্যতম কারণ মাতৃভূমির প্রতি তার দায়বদ্ধতা। সে নারীশিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে। এর পর অনুপমও আর বিয়ে করেনি। মাঝে মাঝে কানপুরে কল্যাণীর কাছে যায়। সুযোগ পেলে তার কাজে সহায়তা করে। এভাবেই অনুপম কল্যাণীকে নিজের করে পায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. অনুপম মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল?**

ক. তীর্থে　　খ. বিয়েবাড়িতে
গ. কন্সর্টে　　ঘ. রেলস্টেশনে

**৬. অনুপমের মন ভরে যায় কেন?**

ক. মধুর স্বরে
খ. কর্কশ আচরণে
গ. জড়ানো ভঙ্গিতে
ঘ. বাঁজখাই কথায়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ফাল্গুনি বিয়ে ভাঙার পর থেকে পথশিশুদের আলোকিত করার কাজ গ্রহণ করেছে। এটিতেই সে খুব আনন্দ উপভোগ করে।

**৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'অপরিচিতা' গল্পে কার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. কল্যাণী
খ. অনুপম
গ. হরিশ
ঘ. বিনু

**৮. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে–**

i. সাহসিকতা
ii. অভিমান
iii. আত্মমর্যাদা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৯. গজানন কে?**

ক. কার্তিক
খ. গণেশ
গ. ব্রহ্মা
ঘ. প্রজাপতি

**১০. কল্যাণী কেন বিয়ে করবে না?**

ক. মামার নিষেধে
খ. ব্যক্তিত্বের জাগরণে
গ. যৌতুকের কারণে
ঘ. মাতৃ-আজ্ঞায়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

আশুতোষ মুখার্জি উচ্চশিক্ষিত ও রুচিবান একজন মানুষ। তিনি কনের পিতা। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের মামা কনের গহনা পরীক্ষা করতে চাইলে আশুতোষ বাবু ঠাণ্ডা মাথায় তা করতে দেন।

**১১. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের যে চরিত্রের মিল রয়েছে–**

ক. গজানন
খ. হরিশ
গ. শম্ভুনাথ
ঘ. বিনু

**১২. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের পিতা চরিত্রে মিল রয়েছে যে বিষয়ে–**

i. সৌজন্যবোধ
ii. সহনশীলতা
iii. নির্মমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

এমনকি, কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না। কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে, তাই, বেহাইয়ের নিকট

সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

ক. অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করে?

খ. শম্ভুনাথ কন্যাকে পাত্রস্থ করলেন না কেন?

গ. উদ্দীপকের রামসুন্দরের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর অমিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপকে লোকাচারকে মান্য করা হলেও 'অপরিচিতা' গল্পে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

লিটন ও রুবির বিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পাত্রপক্ষের সাধ্যাতীত যৌতুক দাবি। ফলে একসময় বিয়ে ভেঙ্গে যায়। অথচ রুবিকে লিটনের ভাল লাগে। পরবর্তী সময়ে লিটনের পরিবার বিয়েতে সম্মত হলেও রুবি তাতে অস্বীকৃতি জানায়। কিছুদিনের মধ্যে সে মেয়েদের পড়ানোর জন্য একটি স্কুল গড়ে তোলে। রুবি এখন দেশমাতৃকার সেবায় মগ্ন, বিয়ের স্বপ্ন সে আর দেখে না। স্কুলের মেয়েদের জীবন-স্বপ্নই এখন তার স্বপ্ন।

ক. কল্যাণীর সঙ্গে কয়টি মেয়ে ছিল?

খ. 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন।' –কথাটি কে কাকে এবং কোন প্রসঙ্গে বলেছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কাদের মিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "রুবি ও কল্যাণীর জীবন মূলত একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।" –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে।

**খ.**

বরপক্ষের নিচ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে শম্ভুনাথ তার কন্যা কল্যাণীকে পাত্রস্থ করেননি।

কল্যাণীর বিয়ের দিন পাত্রপক্ষ কনেপক্ষের উপহার দেয়া গহনাগুলো পরখ করার জন্য একজন সেকরাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বর অনুপমের মামা সেকরাকে দিয়ে কল্যাণীর গহনাগুলো পরীক্ষা করান। এতে কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। আর এইসঙ্গে তিনি পাত্রপক্ষের নিচ মানসিকতারও পরিচয় পান। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পিতা শম্ভুনাথের মন ভেঙ্গে যায়। ফলে তিনি বিয়ের দিন কন্যাকে পাত্রস্থ না করে বরপক্ষকে ফিরিয়ে দেন।

**গ.**

আত্মমর্যাদার দিক থেকে উদ্দীপকের রামসুন্দর আর 'অপরিচিতা' গল্পে কনের পিতা শম্ভুনাথের অমিল রয়েছে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কনের বাবা বিয়ের অধিকাংশ দায়িত্ব পালন করেন। বরপক্ষের খাবার-দাবার থেকে শুরু করে তাদের যত্ন করা, মনরক্ষা ইত্যাদি কাজও তাকেই সামাল দিতে হয়। এছাড়া বিয়েতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিবিশেষে নানা আচার এবং রুচির প্রয়োগে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ফলে অনেক সময় কনের পিতাকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় রামসুন্দর মেয়ের বিয়ের পণের তিন হাজার টাকা অনেক ক্ষতি স্বীকার করে সংগ্রহ করেছেন। আর প্রচলিত লোকাচারের কারণে তিনি তার বেহাইয়ের নিকট অবনত। রামসুন্দর মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে বরপক্ষের অপমানকে নীরবে সহ্য করেছেন। অন্যদিকে 'অপরিচিতা' গল্পে কনের পিতা শম্ভুনাথ বাবু মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু যখন বরপক্ষ গহনাগুলো যাচাই করার জন্য কল্যাণীর শরীর থেকে খুলে নিয়ে আসে তখন তিনি অপমানিত বোধ করেন। তিনি মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে দেন। বরপক্ষের নিকট মাথা নত করেননি। এখানেই উদ্দীপকের রামসুন্দরের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর অমিল রয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশের গত শতকের রক্ষণশীল, অনুদার ও যৌতুকের অভিশাপে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থা উভয় গল্পেরই পটভূমি।

**ঘ.**

'উদ্দীপকে লোকাচারকে মান্য করা হলেও 'অপরিচিতা' গল্পে তা অস্বীকার করা হয়েছে।'– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

যৌতুকপ্রথা আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক ব্যাধি। পুরুষপ্রধান সমাজে যৌতুকপ্রথা নারীকে হেয় করে, অপদস্ত করে। এর ফলে কখনো কখনো নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তবুও আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে চান এই মরণ ব্যাধিকে নির্মূল করতে।

উদ্দীপকে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা রামসুন্দরের বর্ণনা রয়েছে। তার অনেক টাকা-পয়সা নেই। কন্যার বিয়েতে তাকে তিন হাজার টাকা পণ দিতে হয়েছে। এর জন্য তাকে অনেক অপমান, অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। মেয়ের সুখের জন্য তাকে বেহাইয়ের নিকট অবনত হতে হয়েছে। 'অপরিচিতা' গল্পেও দেখা যায়, পিতা শম্ভুনাথ মেয়ের বিয়েতে পণ দিয়েছেন। কিন্তু কল্যাণী তার একমাত্র মেয়ে বলেই তিনি পণ দিতে রাজি হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বরপক্ষের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে বিয়েটি ভেঙ্গে দেন। এমনকি, কল্যাণীও প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর কোনোদিন বিয়ে করবে না।

উদ্দীপকে লোকাচারের বলয়ে একজন অসহায় পিতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। আর 'অপরিচিতা' গল্পে বাবা শম্ভুনাথ বাবু ও তার কন্যা কল্যাণী যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। বস্তুত উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে যৌতুকপ্রথার নিষ্ঠুরতা ও ব্যক্তিজীবনে এর প্রভাব এবং 'অপরিচিতা' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে একটি পরিবারের সুদৃঢ় অবস্থান। ওপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে লোকাচারকে মান্য করা হলেও 'অপরিচিতা' গল্পে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

ক. কন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন কে?

খ. অনুপম তার মামাকে ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট বলেছে কেন?

গ. উদ্দীপকের কন্যা 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে যৌতুকের প্রতি লোভী মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পে যৌতুকের বিরুদ্ধে পারিবারিক প্রতিরোধ পরিলক্ষিত হয়।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক

# বিলাসী

## শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

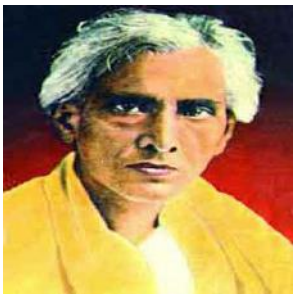

## লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এফএ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে। তিনি জীবনের প্রথমদিকে একটি জমিদারী এস্টেটে সামান্য চাকরি করেন। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু এ-বৈরাগ্যময় জীবনে তাঁর মন টেকেনি। ১৯০৩ সনে তিনি সমুদ্র পথে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে রেল-অফিসে কেরানি পদে চাকুরি করেন। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। ১৯০৩ সালে প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৬ সনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর স্থান শীর্ষে। বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনার ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে অংকিত করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কথাকে সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মানুষের মনুষ্যত্বকেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখেছেন। বেদনালাঞ্ছিত মানবতার রূপ অঙ্কনে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সাধারণ বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন হাসি-কান্নার উপাখ্যান প্রীতি ও করুণার রসে সিক্ত করে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

**তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :**

**উপন্যাস :** *বড়দিদি* (১৯১৩), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *শ্রীকান্ত* (৪ পর্ব, ১৯১৭-১৯৩৩), *গৃহদাহ* (১৯২০), *দেনা পাওনা* (১৯২৩), *পথের দাবী* (১৯২৬), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১);

**গল্পগ্রন্থ :** *রামের সুমতি* (১৯১৪), *মেজদিদি* (১৯১৫), *বিলাসী* (১৯১৮), *ছবি* (১৯২০), *হরিলক্ষ্মী* (১৯২৬)।

## ভূমিকা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায়। এই গল্পে লেখক ন্যাড়া নামের যুবকের জবানিতে তাঁর নিজের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। এই গল্পে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠুর আচরণের উর্ধ্বে দুই মানব মানবীর প্রেমের মহিমা ফুটে উঠেছে। দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ সব কিছুর উর্ধ্বে মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসার আবেদন এই গল্পের মূল বিষয়।

## সাধারণ উদ্দেশ্য

**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পটি পড়ার পর আপনি–**

- জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথার চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

# পাঠ-১

১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন।
- পল্লিগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাথমিক পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- সেবাপরায়ণা বিলাসীর চরিত্রের বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রামের মানুষের সাধারণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই– দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লিগ্রামে, তাহাদের ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এ কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতের চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়– চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি– বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-স্বরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এ কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান– তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লির দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ঐ চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই– দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দুই তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা– কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী, এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে– এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ। এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে– তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এই খবর আমরা কেহই জানিতাম না– সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়– আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা– সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কী! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়– উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেই দিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই– বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা তো দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এই কথাও কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না– গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এই যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি– মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের ওপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ঐ মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বসো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না তো! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এ বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম না। এ দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় তো যে-কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এ বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কী করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এ প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি– বাটীতে ছেলেপুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এ রাত্রেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তা পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? এমনি কত কী। কিন্তু আমার তো আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেয়া চাই– অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভাই, যা হবার সে তো হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কী হইবে? রাতটা কাটুক না।"

বলিলাম "অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।"

তিনি বলিলেন, "হোক কাজ, তুমি বসো।"

বলিলাম, "বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে", বলিয়া পা বাড়াইবা মাত্রেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপরে। আমি একলা থাকতে পারব না।"

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তাঁর মৃতদেহটা এ অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এ কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নহে, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লিগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অতবড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এ যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লিগ্রামে ছিল কিনা, কিন্তু একালে তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অভিপ্রায়**– ইচ্ছা। **অচৈতন্য**– অজ্ঞান।**এডেন–** লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত। **এমনি সুনাম–** দুর্নাম বোঝাতে বিদ্রূপ করা হয়েছে। **ওপরের আদালতের হুকুমে–** স্রষ্টার নির্দেশে। **কানাচ–** ঘরের পেছন দিককার লাগানো জায়গা। **কামস্কাট্‌কা–** প্রকৃত উচ্চারণ কামচাট্‌ক (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর-পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য তুন্দ্রা ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে এখানে। প্রচুর স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম– পেত্রোপাভ্‌লোভস্ক্। **কৃতবিদ্য–** বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পণ্ডিত, বিদ্বান। **ক্রোশ**– এক ক্রোশ দুই মাইলের সমান। **খেজুরমেতি–** খেজুর গাছের মাথার কাছে নরম মিষ্টি অংশ বা রস। **গুলি–** আফিঙের তৈরি একরকম মাদক যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়। **চল্লিশের কোঠা–** এখানে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা। **জনশ্রুতি**– লোকে বলে এমন। **জ্যান্ত**– জীবন্ত। **তক্তপোষ**– খাট। **তোগলক খাঁ–** ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন : গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক। **থার্ড ক্লাস–** বর্তমান অষ্টম শ্রেণি। সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণি হিসাব করা হতো ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণি তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস। **দণ্ড–** শাস্তি। **পারশিয়া–** পারস্য বা ইরান দেশ। **প্রকৃতিস্থ–** স্বাভাবিক অবস্থা। **প্রদীপ–** বাতি, আলো। **প্রত্নতাত্ত্বিক–** পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি। **ফোর্থ ক্লাস–** এখনকার সপ্তম শ্রেণি। **বঁইচি–** কাঁটাযুক্ত একরকম ছোট গাছ ও তার ফল। **বাটীতে**– বাড়িতে। **মালো–** সাপের ওঝা, অনগ্রসর শ্রেণিবিশেষ। এরা সাপ ধরতে, সাপের কামড়ের চিকিৎসায় ও সাপের খেলা দেখাতে পটু। এসব করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। **মা-সরস্বতী–** হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণি। **যমরাজ**– মৃত্যু দেবতা। **রম্ভার কাঁদি–** কলার ছড়া। **শিয়রে**– মাথার নিকটে। **সহমরণে**– একত্রে বা এক সংগে মরণ। **সাইবেরিয়া–** এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে। **সেকেন্ড ক্লাস–** এখনকার নবম শ্রেণি। **সদ্ব্যয় করিয়াছি–** অপব্যয় করেছি বোঝাতে ব্যঙ্গ ভরে বলা হয়েছে। **হুমায়ূন–** মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা।

**তারপর একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।–**

সমাজের সচ্ছল অভিভাবকগণ লেখাপড়ার প্রতি সব সময়ই সজাগ থাকেন। বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও পথ দুর্গম হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করা কষ্টকর। তাছাড়া, দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠাভ্যাস করা সম্ভব হয় না। ফলে, অনিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসের কারণে পড়ালেখার প্রকৃত মান অর্জনে শিক্ষার্থীগণ সাফল্য লাভ করে না। সন্তানের লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদগ্রীব অভিভাবকগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতেন। শহরের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অভিভাবক ও সন্তান-সন্ততিগণ পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন না। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামো সৃষ্টির অভাবে গ্রাম বাংলার এ করুণ চিত্র যেন চিরকালের।

## সারসংক্ষেপ

পল্লিগ্রামের বিদ্যার্থীদের শিক্ষায় সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। শতকরা প্রায় আশি জন শিক্ষার্থীকে জীবনে এ দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য একটি গ্রাম থেকে দূরবর্তী অবস্থানের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য শিক্ষার্থীর অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে, বিদ্যাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় শ্রমক্লান্ত অবসন্ন শরীর প্রদান করতে পারে না। কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীর নিকট বিদ্যালয়ে যাত্রাপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের আকর্ষণের উপকরণ এত বেশি প্রলুব্ধ করে যে, শিক্ষা লাভের জন্য আবশ্যক তথ্যগুলি বড় বেশি অনাবশ্যক বলে মনে হয়। মৃত্যুঞ্জয় লেখকের একই গ্রামের ছেলে। নিরীহ, পরিজনহীন মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের প্রান্তে একটি বিশাল পোড়ো

বাড়িতে একাকী বসবাস করত। বাড়ি সংলগ্ন প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান থেকে প্রতি বৎসর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের ভালোভাবেই চলত। এ বাগানটির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র দূর সম্পর্কের খুড়া একজন ভাগীদার বলে সকলের নিকট বলে বেড়াত। কিন্তু এ দাবীর প্রতি সত্যনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ না থাকায় মৃত্যুঞ্জয়ের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাস অর্থাৎ ৮ম শ্রেণির ছাত্র হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু এ ক্লাসের ছাত্র হিসেবে কত দিন ধরে অধ্যয়ন করে আসছে সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা। স্বল্পভাষী মৃত্যুঞ্জয় প্রতিদিন জীর্ণ মলিন পুস্তক বগলে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করত। কারো সংগে সে নিজে থেকে আলাপ না করলেও অনেকেই উপযাচক হয়ে আলাপ করতে উৎসাহী ছিল। কারণ, অন্যকে খাওয়ানো এবং গোপনে অর্থ সাহায্য করতে মৃত্যুঞ্জয়ের কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু এহেন পরোপকারী, নিরহংকার মানুষটির প্রতি গ্রামবাসী যে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল তা নয়।

দীর্ঘদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা না পেয়ে লেখক খোঁজ খবর নিতে গিয়ে লোকমুখে তার অসুস্থতার সংবাদ জানতে পারেন। একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লেখক তাকে দেখতে যান। মরণব্যাধির সংগে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বেঁচে ওঠা, জীর্ণ কংকালসার শরীর দেখে লেখক বুঝতে পারেন, অপরিমেয় সেবা ও যত্নে এ যাত্রায় মৃত্যুঞ্জয় রক্ষা পেয়েছে। দিবারাত্র অনলস সেবা ও অবিরাম রাত্রি জাগরণের ছাপ নিয়ে রোগীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো নারীই যে দরিদ্র সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী একথা লেখক বুঝতে পারেন। সেবা, শুশ্রূষা, মমতা ও হৃদয়ের অপরিমিত প্রাণশক্তি নিয়ে পাশে না দাঁড়ালে এমন রোগীকে বাঁচানো দুঃসাধ্য। অসম গোত্রের এক নারী সমাজের সকল ভ্রূকূটি উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার এমন উদাহরণ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অথচ মৃত্যুঞ্জয়ের নিত্য সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো গ্রামবাসী তার রোগশয্যা পার্শ্বে এ সময়ে উঁকি মেরে দেখে নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি পল্লিগ্রামের মানুষের বিপদে আপদে ঔদাসীন্যের পরিচয় লেখক আলোচ্য অংশে অত্যন্ত তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. বঁইচি কী?**

ক. কাঁটাযুক্ত ছোট গাছ
খ. কাঁটাবিহীন ছোট গাছ
গ. কাঁটাযুক্ত বড় গাছ
ঘ. কাঁটাবিহীন বড় গাছ

**২. 'সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–**

ক. প্রত্যাশা
খ. হতাশা
গ. বিষাদ
ঘ. ব্যঙ্গ

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

'শেষ পরিচয়' উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অমূল্য বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র।

**৩. উদ্দীপকের অমূল্য'র সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. ন্যাড়া
খ. খুড়া
গ. বিলাসী
ঘ. বিলাসীর বাবা

**৪. উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?**

i. ছোটগল্পের আঙ্গিকগত দিক
ii. ছোটগল্পের নামকরণ
iii. ছোটগল্পের বিষয়বস্তু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

# পাঠ-২

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার চিত্রটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সবলের উপরে দুর্বলের অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন।
- সুবিধাভোগীর শ্রেণিচরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অসহায়ক্লিষ্ট মানুষের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের করুণ পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভালোবাসার শক্তি যে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন থেকে প্রাপ্ত ঘটনার আলোকে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজে প্রচলিত অমানবিক আচরণের চিত্র অংকন করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না– অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ে মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে– ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা– অ্যাঁ এ হইল কী? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের ওপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়ো ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনো কালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে দশ-বারোজন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না। কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কী কথা! সনাতন হিন্দু এ

কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে– রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপনারা মনে করিবেন না; পল্লিগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে তো আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা– এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী। কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে তো আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লিগাঁয়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে, তারাই তো একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া।

এই তো ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা-উত্তর ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কী, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণে নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এ দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেরই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুর বেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালোপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা– কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যে জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রাস পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে– তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই

ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই তো মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বইজন নরনারীই ঐ পল্লিগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, "তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।"

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা ওখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কী জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে–

–ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন–

মনসা দেবী আমার মা–

ওলটপালট পাতাল-ফোঁড়–

ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে–

–দুধরাজ, মণিরাজ।

কার আজ্ঞা– বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন– নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন– তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে তো ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপধরাও কঠিন নয় এবং ধরাসাপ দুই চারিদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান

হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এ কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করে মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে– এতে দোষ কী?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের তো খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাইতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বার বার লক্ষ করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত– আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কী। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার তো এক রকম নেশার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এ পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে– সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় এক-জোড়া তো আছে বটেই, হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখছ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।

বিলাসী কহিল দু-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিস গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি তো ছিলই, তাহার উপরেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই "বিষহরির আজ্ঞা" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও বা একসঙ্গে কখনও বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম তাহার শ্বশুরের দেয়া মন্ত্রৌষধি সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাড়াইব না। কেবল এটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।

আমার মাদুলি-কবচ তো মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখনই যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোলআনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, তো হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে তো তেমন আসে যায় না– না হয় একটু নিন্দাই হত। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কী! অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো পল্লিগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই তো মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক document তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Contract পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী-অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নহে, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এ বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এ হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মতো বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মতো পাপ হয় না।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অকালকুষ্মাণ্ড**– অপদার্থ। **এন্ট্রান্স**– এস.এস.সি পাশের সমতুল্য। **কালি–** আধুনিক কাল অর্থে। **তিলার্ধ**– বিন্দুমাত্র, সামান্যমাত্র। **দক্ষিণা**– ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর পর প্রদত্ত অর্থ। **পিণ্ডি**– শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করা গোলাকার চালের ডেলা। **প্রায়শ্চিত্ত**– চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধন। **ফলাহার–** ফল-ভোজন, নিরামিষ দ্রব্য দ্বারা ভোজন বা আহার। **বদনদগ্ধ**– লজ্জায় মুখ দেখাতে না পারা অর্থে। **বারওয়ারী–** সমবেতভাবে যে অনুষ্ঠান বা উৎসব করা হয়। **সম্ভাষণ**– সম্বোধন। **ম্লেচ্ছদেশে**– অনার্য, অস্পৃশ্যদের দেশ। **মনসা**– সাপের দেবী। **সাগরেদ**– শিষ্য।

## সারসংক্ষেপ

মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ের সংবাদ এবং বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ার অপরাধে খুড়া সকল গ্রামবাসীকে জড়ো করে এরূপ সামাজিক অনাচার ও গর্হিত কাজের জন্য বিচার জানায়। গ্রামের অনেকে সোৎসাহে বিলাসীকে নির্দয় প্রহার করে।

মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, সে অন্নপাপী। দীর্ঘদিন ন্যাড়ারূপী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীদের সংগে কোনো প্রকার যোগাযোগ ছিল না। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাস জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজগ্রামে চলে আসেন। মৃত্যুঞ্জয় লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বিলাসীর সংগে দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। নিজ জাত-ধর্ম ত্যাগ করে বিলাসীর পিতৃপেশা গ্রহণ করে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে হিসেবে এখন পরিচিত। সাপ ধরাই এখন তার একমাত্র পেশা। ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মহা উৎসাহে সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত। বিলাসী ন্যাড়া ও মৃত্যুঞ্জয়কে এ পেশা ত্যাগ করার জন্য বহুভাবে অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়। অবশেষে একদিন সাপ ধরতে গিয়েই মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়। ওঝা, বৈদ্যের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। বিলাসী জীবনের সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার বিনিময়ে যে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছিল- তার পক্ষে মৃত্যুঞ্জয়বিহীন জীবনযাপন করা আর সম্ভব ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে। ছোটজাত, নিম্নবর্ণের বিলাসীর মহৎপ্রেমের এ একনিষ্ঠতার প্রকাশ পাঠক মনকেও ভারাক্রান্ত করে তোলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. ন্যাড়ার সন্ন্যাসগিরিতে ইস্তফা দেয়ার কারণ কী?**

ক. বাঘের ভয় | খ. সাপের ভয়
গ. মশার কামড় | ঘ. সাধনায় কষ্ট

**৬. 'কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়'– 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের এই পরিবর্তন কোথায় ঘটেছে?**

ক. অন্নপাপে | খ. জাত বিসর্জনে
গ. স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় | ঘ. সম্পদ হারানোয়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা মনীষা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে আশিককে পরিবারের অমতে বিয়ে করে। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আজ সে আটপৌরে জীবনযাপন করছে।

**৭. উদ্দীপকের মনীষা 'বিলাসী' গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?**

ক. মৃত্যুঞ্জয় | খ. বিলাসী
গ. ন্যাড়া | ঘ. পুত্রবধূ

**৮. উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?**

i. শ্রেণিবৈষম্য
ii. কুসংস্কার
iii. মূল্যবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. iii | ঘ. ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৯. বিলাসী কার মেয়ে?**

ক. পুরোহিত | খ. সাপুড়ে
গ. কৃষক | ঘ. পুলিশ

**১০. 'গেল গেল গ্রামটা রসাতলে গেল' –কেন?**

ক. মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর বিবাহে | খ. ন্যাড়া বিলাসীকে সহমর্মিতা দেখানোয়
গ. মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কেটেছে | ঘ. বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে ভাত খাওয়ানোয়।

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

'অচলায়তন' নাটকে অচলায়তন বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর। এর শিক্ষার্থীরা প্রথা, বিধান ও সংস্কারের দাস। পাশের গ্রামে নীচু জাতের লোকেরা বাস করে। দাদাঠাকুর এদের সঙ্গে মেশার জন্য আর বিদ্যামন্দিরে অবস্থান করেন না।

**১১. উদ্দীপকের দাদাঠাকুরের সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পে কোন চরিত্রটির মিল রয়েছে?**

ক. বিলাসী　　খ. মৃত্যুঞ্জয়

গ. ন্যাড়া　　ঘ. খুড়া

**১২. উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন সামাজিক দিকটি ফুটে উঠেছে?**

i. বর্ণপ্রথা

ii. অজ্ঞতা

iii. শ্রেণিবৈষম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

গৌরাঙ্গ রায় উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী হলেও সমাজের প্রচলিত সংস্কারকে উপেক্ষা করার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা তার ছিল না। কিছুদিন পূর্বে তার গ্রামের গোঁড়া হিন্দুরা এক কিশোরী মেয়েকে মৃতপ্রায় কুলীন বরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেয়। গৌরাঙ্গ রায় কাজটিকে মন থেকে সমর্থন না করলেও সেদিন তিনি গোঁড়াদের সঙ্গেই ছিলেন।

ক. সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসায় কোনটি?

খ. 'গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম' –বুঝিয়ে লিখুন।

গ. উদ্দীপকের গৌরাঙ্গের সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়ার কীভাবে সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের সহজাত বিকাশের অন্তরায়।" –উদ্দীপক ও 'বিলাসী' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

আমাদের দেশে সনাতন সমাজে বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যাটা বেশ প্রকট। এই জাতপাতের সমস্যার কারণে বহু ছেলেমেয়ের জীবন অকালে ঝরে যায়। রক্ষণশীল সমাজ উঁচু ও নিচুকুলের বিবাহ সহজে মেনে নিতে পাওে না। তারা নানা উপায়ে বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে গ্রামছাড়া করতেও দ্বিধা কওে না।

ক. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটি কত বিঘার ছিল?

খ. 'চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি।' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের কোন বিষয়টি 'বিলাসী' গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'বিলাসী' গল্পের সমাজ-বাস্তবতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসায় হচ্ছে শিকড় বিক্রি করা।

**খ.**

গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে ব্যঙ্গ করে 'সুনাম' বলা হয়েছে।

'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের এক জ্ঞাতি খুড়া ছিল। এই খুড়া তার নামে গাঁজা খাওয়া, গুলি খাওয়াসহ নানাপ্রকার অপবাদ দিয়ে বেড়াত। এ দুর্নাম প্রচারের কল্যাণে গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামবাসী তার সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা দূরে থাক এমনকি তার সঙ্গে সংশ্রব রাখার কথাটা পর্যন্ত অস্বীকার করত। বস্তুত উক্তিটিতে মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে 'সুনাম' শব্দটি গল্পকথক ন্যাড়া 'দুর্নাম' অর্থে ব্যবহার করেছে।

**গ.**

মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের গৌরাঙ্গ রায় এবং 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলার হিন্দু সমাজ চিরকালীন বা সনাতন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সমাজব্যবস্থা আচারসর্বস্ব ও সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন। কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা কখনো কখনো এ সমাজের মানবিক চেতনাকে সংকুচিত করে রাখে। এ ছাড়া জাতিগত বিভেদের ফলে সমাজে অনেক সময় দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে না।

উদ্দীপকে গৌরাঙ্গ রায় উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী। কিন্তু সমাজের প্রচলিত রীতিকে উপেক্ষা করে একটি কিশোরী মেয়েকে রক্ষা করার মত দৃঢ়তা তার মধ্যে নেই। অন্যদিকে 'বিলাসী' গল্পে দেখা যায়, গল্পকথক ন্যাড়ার মানসিকতাও উদার কিন্তু সে বিলাসীকে গ্রামের মানুষের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি তার দৃঢ়চিত্ত মানসিকতার অভাবে। উদ্দীপকের গৌরাঙ্গ রায় ও 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া কারোর মনই সংকীর্ণ কিংবা গোঁড়া নয় কিন্তু যথেষ্ট সাহসের অভাবে তারা কেউই সমাজের অন্যায়কে রুখে দিতে পারেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের গৌরাঙ্গ রায় ও 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া চরিত্র দুটো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ.**

ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের সহজাত বিকাশের অন্তরায়। আর এই অনাচারের শিকার হয় সাধারণ মানুষ।

প্রাচীনকাল থেকে সনাতন সমাজের আচার-রীতিগুলো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। এই রীতির অনেকগুলো মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায়। অবশ্য অনেকগুলো সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও যা রয়ে গেছে তার কারণেই আজও সাধারণ মানুষ অনেকক্ষেত্রেই নিগ্রহের শিকার হচ্ছে।

উদ্দীপকে ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা বলা হয়েছে। এর শিকার হয়েছে এক কিশোরী নারী। তাকে মৃতপ্রায় এক কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে 'বিলাসী' গল্পে সমকালীন আচারসর্বস্ব হিন্দুসমাজের অনেক অনাচার স্থান পেয়েছে। এই অনাচারের শিকার হয়েছে মূলত মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী। 'বিলাসী' গল্পে পুরুষরা বিলাসীর মত নিরীহ নারীকেও বেদম প্রহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। আবার মৃত্যুঞ্জয়কে সমাজচ্যুত করা হয় অন্নপাপের অপরাধে। ফলে করুণ মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয়ের আর আত্মহনন করে বিলাসী।

উদ্দীপকে ধর্মীয় বাতাবরণে হরণ করা হয়েছে একটি কিশোরীর জীবন। 'বিলাসী' গল্পেও দেখা যায় ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কার নিঃশেষ করেছে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়কে, আর তাদের স্বপ্নকে। উদ্দীপক এবং 'বিলাসী' গল্পের চরিত্রগুলো আমাদের সমাজের নিতান্তই সাধারণ মানুষ, আর তারাই ধর্মীয় গোঁড়ামির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই বলা যায়, ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে অস্বীকার করে আর ধ্বংস করে তাদের স্বপ্নকে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

আমি নারী। আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্ব জয় করবো। ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্ত করবো। তাকে এই হৃদয়ের রক্ততলে বন্দী করবো। আপনি কেন আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে চেষ্টা করছেন?

ক. কামস্কাট্‌কা কোথায় অবস্থিত?

খ. 'আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।' –কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ. বিলাসী চরিত্রে প্রেমের যে গভীরতা ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

ঘ. 'হৃদয়ের অপরিমেয় ভালবাসাই জগতের অশুভ ও অকল্যাণকে দূর করতে পারে।' –উদ্দীপক ও 'বিলাসী' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. ক ৯. খ ১০. ক ১১. খ ১২. ঘ

# চাষার দুক্ষু

## রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

## লেখক-পরিচিতি

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী জহীরুদ্দিন আবু আলী হায়দার সাবের ও মাতার নাম রাহাতন্নেছা সাবেরা চৌধুরানী। তাঁর পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন এবং বিয়ের পর নাম হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ষোলো বছর বয়সে উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। সেকালে নানা কুসংস্কারের কারণে রোকেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয়নি। তবে বাড়িতে বড় বোন করিমুন্নেসার নিকট বাংলা, বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ও বিয়ের পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্চাই নারী মুক্তির জন্য নিবেদিত। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃত না হলে তাদের মনের প্রসার কিছুতেই সম্ভব হবে না এবং মুসলমান সমাজও কিছুতেই গড়ে উঠবে না –একথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য নিজেই মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সমাজ-মনের জড়তা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য কলমযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় ও বলার ভঙ্গিতে কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ ও দীপ্ত রসিকতার সুর সহজেই চোখে পড়ে। নারী মুক্তির পথ হিসেবে নারী শিক্ষা প্রসারে তিনি অগ্রণী জন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও মুসলমান বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাতয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মুসলমান নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।

**তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা–**

**গদ্যগ্রন্থ :** *মতিচূর* (১ম খণ্ড-১৯০৫ ও ২য় খণ্ড-১৯২২), *অবরোধবাসিনী* (১৯৩১);
**উপন্যাস :** *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯০৮), *পদ্মরাগ* (১৯২৪)।

## ভূমিকা

'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী' থেকে চয়ন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক তৎকালীন সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতা ও অন্যদিকে দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার কথা ব্যক্ত করেছেন। কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তিনি শিক্ষা বিস্তারে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উপর এবং গ্রামীণ কুটির শিল্পের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

## সাধারণ উদ্দেশ্য

**রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধটি পড়ার পর আপনি–**

- তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার কথা জানতে পারবেন।
- লেখক কৃষকদের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সভ্যতার নামে মানুষের বিলাসিতাকে কেন দায়ী করেছেন তা বুঝতে পারবেন।
- কৃষকদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য করণীয় কী, তা জানতে পারবেন।

# পাঠ-১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- সভ্যতার তথাকথিত রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সভ্যতা ও সামাজিক উন্নতির উল্টো পিঠে কৃষকদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানুষের বিলাসিতা কীভাবে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা লিখতে পারবেন।

## মূলপাঠ

"ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।"

শুনিতে পাই, দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল, –এই দেড় শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও জাতির সমকক্ষ হইতে চালিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই। –সত্যই তো, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর লরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট দশ জন ডাক্তারে টেপে নাড়ী, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি; লেমলেন্ড জিঞ্জারেন্ড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি) –এসব কি সভ্যতার নির্দশন নহে? নিশ্চয়! যে বলে 'নহে', সে ডাহা নিমকহারাম।

কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে– কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার 'ধানভানিতে শিবের গান' কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লিবাসী কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম তবে কেহ চট্ করিয়া আমার চক্ষে আঙুল দিয়া দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে ইত্যাদি। ভালোর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালোর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল; –এক একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবি হালে থাকে, নবাবি চাল চালে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে, –'পাছায় জোটে না ত্যানা!' ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহতা'লা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, –তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, "ধান্য তার বসুন্ধরা যার"। তাই তো, অভাগা চাষা কে? সে কেবল "ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে", হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে "মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল", এ কথার অর্থ কী? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কী করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা' বঙ্গীয় কৃষকের কথা কী?

আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? দুই একটি উদাহরণ দেখাই– বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিসার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই:

"কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ি লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম" হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অর্ধানশন–** অর্ধেক উপবাস বা অনাহারে থাকা। **অভ্রভেদী–** অভ্র অর্থ আকাশ। অভ্রভেদী অর্থ আকাশ বা মেঘ ভেদকারী, আকাশচুম্বী। **উদরে–** পেটে। **কণিকা–** কণা, ক্ষুদ্র। **কলাই–** এক প্রকার ডাউল। **ক্লেশ–** দুঃখ, কষ্ট। **চরকা–** সুতা কাটার হস্তচালিত যন্ত্রবিশেষ। **চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড–** বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। প্রাচীন কাল থেকে অন্য কুটির শিল্পের মতো সামান্য বৃত্তি থাকলেও কৃষিই এদেশের মানুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি। এমনকি বিশ শতকে পৃথিবীর কিছু দেশ যখন শিল্পে অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে আমাদের দেশ তখনও কৃষির বিকাশকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং কৃষি যে এদেশের মেরুদণ্ড এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। **ছেইলা–** ছেলে, সন্তানসন্ততি অর্থে। **ট্রামওয়ে–** ট্রাম চলাচলের রাস্তা। রেলওয়ের মতো রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে। তবে তা অধিকতর হালকা, বাস চলাচলের রাস্তার ভিতরেও ট্রামওয়ে থাকতে পারে। **দানা–** খাদ্য অর্থে, ছোলা, মটর। **"পাছায় জোটে না ত্যানা"–** পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। চটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাটের চাহিদা ও কদর বেড়ে যায়। পাটকল শ্রমিকগণও পর্যাপ্ত মাসোহারা পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে থাকেন। কিন্তু যারা পাট উৎপাদন করতেন সেই কৃষকদের অবস্থা ছিল মানবেতর। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের জীবন শেষ হতো। প্রবাদটির ভিতর দিয়ে কৃষকদের সেই করুণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। **পৈছা–** স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলঙ্কার। **বায়স্কোপ–** চলচ্চিত্র, ছায়াছবি, সিনেমা। **ব্যঞ্জন–** রন্ধন করা তরকারি। **মরাই ভরা–** ধানের গোলা ভরা। **মসলিন–** অতি কোমল ও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রবিশেষ। সম্ভবত প্রাচীন ব্যাবিলনের মমৌলে নির্মিত সূক্ষ্ম মসৃণ বস্ত্রের মতো ঢাকায় তৈরি বস্ত্রের নাম মসলিন। **সর্বস্বান্ত–** সর্বহারা, সর্বসহায় হারা।

## সারসংক্ষেপ

প্রাবন্ধিক এখানে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের দুঃখদুর্দশা ও তার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন যে, সভ্য মানুষদের খাবার ফলানোর জন্য যারা রোদে পোড়ে আর বৃষ্টিতে ভেজে সেই কৃষকদের অবস্থা কত শোচনীয়। ভারতবর্ষ আজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, সম্পদে পৃথিবীর উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে চলেছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না। তারা পোশাক পায় না, অসুস্থ হলে চিকিৎসা পায় না। চটকল প্রতিষ্ঠার পর কর্মচারীদের জীবন নবাবী হালে কাটলেও পাট উৎপাদনকারী কৃষকরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তেল পাওয়া যেত তখনও কৃষক-কন্যারা মাথায় দেয়ার জন্য এক পয়সার তেল জোটাতে পারত না। কৃষকদের এই চরম দারিদ্রের জন্য তিনি এক শ্রেণির মানুষের চরম বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. বায়োস্কোপ কাকে বলে?**

ক. চটকল
খ. বিলাসিতা
গ. কর্মবিমুখতা
ঘ. চলচ্চিত্র

**২. 'এন্ডি' বলতে বোঝায়–**

ক. মোটা রেশমি কাপড়
খ. স্বচ্ছ কাচের চুড়ি
গ. সুতা পাকাবার যন্ত্র
ঘ. মণিবন্ধনের অলঙ্কার

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

শের শাহের আমলে বাংলায় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। সন্দেহ নেই তথ্যটি বাংলার সমৃদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু তখনও এদেশে কৃষকদের জীবনে দুর্দশার অন্ত ছিল না।

**৩. উদ্দীপকে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. চাষির অনুকরণপ্রিয়তা
খ. কৃষকের ঐতিহ্য
গ. কৃষকের দারিদ্র্য
ঘ. চাষির গৌরব

**৪. উদ্দীপক ও 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের উপজীব্য–**

i. বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা
ii. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংকট
iii রংপুরের চাষির অন্তর বেদনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

## পাঠ-২

### পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- কৃষকদের জীবনের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সভ্যতার সাথে দারিদ্র্য বৃদ্ধির সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- আমাদের দেশে রেশম শিল্পের বিলুপ্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কৃষকদের দারিদ্র্য মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

### মূলপাঠ

এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বিহার অঞ্চলে দুই সের খেসারি বিনিময়ে কৃষক-পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত। পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা 'পখাল' (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। শুঁটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র-জলে চাউল ধুইয়া ভাত রাধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাট শাক, লাউ শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত। আর পরিধান করিত কী, শুনিবেন? পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিম্বা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত। শীতকালে দিবা ভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালি (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে:–

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে।

পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র তো এই, তবে "মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল-ভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল" ইত্যাদি কোন সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বের অবস্থা। যখন–

কৃষক-রমণী স্বহস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 'এন্ডি' বলে। এন্ডি রেশনের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সুতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সুতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এন্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোনো অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এণ্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা– কিছুই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র-সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই–

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক্।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে– সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবার কারণ কী? কারণ– যেহেতু আপাত সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চণ্ডি রকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এন্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লিবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে "পাছায় জোটে না ত্যানা" কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে তো! "বৌ-এর পৈছা বিকায়" কিন্তু তবু "বেলোয়ারের চুড়ি" থাকে তো! মুটে মজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়– কিন্তু ঐ যাঃ, যাইতে আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এইরূপে দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানি চাই, ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে :

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা,
ঔষধ দিব কোথা?

আর–

এ বহ্নির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকাবাহকগণ পাল্কি লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে।

আবার মজা দেখুন, আমরা তো সুসভ্য হইয়া এণ্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই 'আসাম সিল্ক' নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা হইতে লাগিল! ক্রমে পল্লিবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এন্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর 'হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডল'র দোকানে 'আসাম সিল্ক' পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এন্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়– তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই তো সেদিনের কথা– বঙ্গের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একখানি দেশি রেশমি রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কারমাইকেল ইংরাজ বাচ্চা– সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে

মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রামে ঐরূপ রেশমি রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লিগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে, চাষার দুক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই "মরাই-ভরা ধান, ঢাকা মসলিন" ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশি শিল্প– বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**এন্ডি–** মোটা রেশমি কাপড়। **কৌপিন–** ল্যাঙ্গট, চীরবসন, লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্র। **চালাঘর–** তৃণ বা কড়ের দ্বারা নির্মিত ছাদবিশিষ্ট ঘর। **চেটাই–** আঞ্চলিক শব্দ, মাদুর। **টেকো–** সুতা পাকাবার যন্ত্র। **বেলোয়ারের চুড়ি–** উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত চুড়ি। **ভিটি–** পৈতৃক বাস্তভূমি। **মহীতে–** পৃথিবীতে।

## সারসংক্ষেপ

অভাব অনটনের কারণে কৃষক-পত্নী মাত্র দুই সের খেসারির বিনিময়ে কন্যা বিক্রি করত– লেখক এখানে এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা বলেছেন। কৃষকের পান্তা ভাতের সাথে জুটত কেবল লবণ। শুঁটকি ছিল তাদের উপাদেয় খাদ্যের তালিকায়। রংপুরের কৃষকেরা ভাত না পেয়ে লাউ, কুমড়া, শাক প্রভৃতি সিদ্ধ করে খেত। পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কাপড় সংগ্রহ করে দিত। গ্রামের কৃষকদের দারিদ্র্যের নেপথ্যে গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয়কে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃটিশ শাসকদের দ্বারা রেশমের এন্ডি শিল্পকে ধ্বংসের কারণে আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্যসমাজ চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। এ দুরবস্থার জন্য লেখক এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতা ও বিদেশি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকেও দায়ী করেছেন। কৃষকদের এই সংকটজনক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য লেখক দেশি শিল্পের পুনরুদ্ধার ও গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. শিবিকাবাহকগণ কিসে যাতায়াত করলে সভ্যতার চূড়ান্ত হবে?**

ক. ট্রামে　　খ. রেলওয়েতে
গ. স্টিমারে　　ঘ. মোটরে

**৬. 'আসাম সিল্ক' বলা হয়েছে–**

ক. এন্ডি　　খ. ফ্লানেল
গ. জুট　　ঘ. মসলিন

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

গণি মিয়া একজন কৃষক। তার নিজের জমি নেই। পরের জমি চাষ করে সে সংসার চালায়। নিজের কাছে টাকা না থাকলেও ছেলের বিয়েতে ঋণ করে সে অনেক ধূমধাম করেছে।

**৭. উদ্দীপকের গণি মিয়া 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কার প্রতিনিধি?**

ক. পাটকল শ্রমিক　　খ. জুটমিলের কর্মচারী
গ. বাংলার কৃষক　　ঘ. বিহারের প্রজা

**৮. উদ্দীপক এবং 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে–**

ক. বিলাসিতা
খ. অনুকরণপ্রিয়তা
গ. সভ্যতা
গ. শিক্ষা বিস্তার

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**৯. চাষির উদরে অন্ন নেই কেন?**

ক. শোষণের ফলে
খ. বঞ্চনার ফলে
গ. শাসনের ফলে
ঘ. বিলাসিতার ফলে

**১০. চাষিদের সভ্য হওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে–**

ক. বিলাসি হওয়া
খ. সমৃদ্ধি লাভ করা
গ. অলস হওয়া
ঘ. ঐতিহ্য রক্ষা করা

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা–

**১১. উদ্দীপকের সঙ্গে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের কোন বাক্যটির সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড।
খ. ধান ভানিতে শিবের গান।
গ. মরাই ভরা ধান ছিল।
ঘ. চাষা এসেছে শুধু সহিতে।

**১২. উদ্দীপক ও 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে –**

i. চাষির সৌভাগ্য
ii. চাষির হতাশা
iii. চাষির বন্দনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

**সৃজনশীল প্রশ্ন–১ :**

বাংলাদেশের সমাজ জীবনের মূলে রয়েছে গ্রাম। এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে এদেশে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক জীবনধারা গড়ে উঠলেও গ্রামীণ সমাজ তিরোহিত হয় নি। তবে গ্রামীণ সমাজ তার ঐতিহ্য হারিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আজ বাংলাদেশের গ্রামীণ হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প প্রভৃতি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে পল্লিবাংলা আজ শ্রীহীন, তার অঙ্গে শোভা নেই। আজকের পল্লিবাংলার এই ক্লেদ ও বঞ্চনা ঘুচাতে হলে বাংলার গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের বিস্তার ঘটাতে হবে।

ক. রবীন্দ্রনাথের মতে ধান্য কার?
খ. 'পাছায় জোটে না ত্যানা।' –কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি বেগম রোকেয়ার সমাজভাবনাকে ধারণ করেছে।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন–২ :**

দিন কেটে যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। গ্রামের সেই উচ্ছল কুমোরপাড়ার এখন বেহাল দশা। তাঁতিরাও দিন আনে দিন খায়। বাঁশ-বেতের শিল্প এখন আর তৈরি হয় না। কৃত্রিম আঁশের জিনিসপত্র বাজার দখল করায় পাট চাষিরা আর আগের মতো নেই। বাজারে নেই পাটশিল্পজাত অন্য দেশীয় পণ্য। দেশের এক শ্রেণির মানুষ সম্পদের মালিক হলেও অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

ক. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পল্লিগ্রামে কী বিস্তারে সচেষ্ট হতে বলেছেন?
খ. 'আসাম সিল্ক' হারিয়ে যাওয়ার কারণ কী? –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকটি 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের মূলভাব প্রতিফলিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**
কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে বসুন্ধরা যার ধান্য তার।

**খ.**
'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের কথা বলা হয়েছে।
বাংলায় পাটকল প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশে ক্রমে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে পাটকল শ্রমিকরা জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি পেয়ে আনন্দচিত্তে দিনযাপন করে। কিন্তু পাটচাষিরা যারা পাট উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তারা অর্থাভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। 'পাছায় জোটে না ত্যানা' কথাটি দিয়ে প্রাবন্ধিক কৃষকদের এ হীন অবস্থারই চিত্র তুলে ধরেছেন।

**গ.**
কৃষকের শোষিত হওয়ার বিষয়টিতে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলার কৃষক এদেশের সমাজের চালিকাশক্তি। কিন্তু নানা কারণে তারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়। এদেশের চাষিরা সারাদিন রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কঠোর পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলায়। কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত ফসলে নিজেদের সমৃদ্ধ করে শোষক সম্প্রদায়। এই কৃষকের দিন কাটে অনাহারে, অর্ধাহারে কিংবা বস্ত্রহীন অবস্থায়।

'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে পাটকল আর চটকল মালিকদের কৃষকদের শোষণের কথা বর্ণিত হয়েছে। বাংলার কৃষকরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। কিন্তু তারা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। অথচ তাদের পরিশ্রমের ফসলই দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখে। অন্যদিকে, উদ্দীপকে দেখা যায় এদেশের গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ঘরানার বিলাসিতার কারণে এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংসের পথে। ফলে গ্রামের মানুষ আজ অনাহারী, তাদের পরনে বস্ত্র নেই। পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে তাদের কাছে জীবনের মানেও আজ ভিন্নতর। উদ্দীপকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলার অর্থনীতি ধ্বংসের মৌল কারণ শোষণের বিষয়টি এখানে উল্লেখিত হয়নি। তাই বলা যায়, শোষণের বিষয়টিতে আলোচ্য প্রবন্ধ ও উদ্দীপকটিতে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ.**
রোকেয়ার সমাজ ভাবনা বিস্ময়কররূপে সমকালীন, কেননা বাংলাকে বাঁচাতে হলে কুটির শিল্প তথা শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষারও বিস্তার ঘটাতে হবে।

বাংলার সাধারণ কৃষকেরা সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে জীবনধারণের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। কিন্তু কিছু কৃষক ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণে বিলাসী জীবন যাপন করে। অবশ্য তারা একসময় চরম দারিদ্র্যেরও শিকার হয়। বাংলার চাষিদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিলাসিতা ত্যাগ করার পাশাপাশি শিল্পের বিকাশ ও সুশিক্ষার বিস্তারণ প্রয়োজন। তা হলেই তারা মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে সমৃদ্ধ হতে পারবে।

'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে বাংলার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে দেখা যায়, তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। তারা কঠোর পরিশ্রম করে মাঠে ফসল উৎপাদন করে ঠিকই কিন্তু এর ন্যায্যমূল্য পায় না। কৃষকদের মধ্যে আবার একটি শ্রেণি বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণে এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য কুটির শিল্প ধ্বংস হওয়ার পথে। আলোচ্য প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া স্বপ্ন দেখেছেন বাংলার কৃষকরা একদিন আত্মনির্ভরশীল হবে। এজন্য তিনি এদেশের গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন বাংলার আনাচে কানাচে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে পারলেই এদেশের কুটির শিল্প বেঁচে থাকবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হতে

পারবে। উদ্দীপকেও গ্রামবাংলার মানুষের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে এখানকার কুটির শিল্পের একসময় বিশ্বজুড়ে খ্যাতি ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে তা আজ ধ্বংসের মুখে। গ্রামবাংলাকে রক্ষা করতে হলে এই প্রাচীন শিল্প তথা কুটির শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য পল্লিবাংলায় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। তবেই গ্রামবাংলার মানুষ যে শ্রীহীনতায় রয়েছে তা কেটে যাবে।

উদ্দীপক এবং 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধ উভয়টিতেই পল্লিবাংলাকে বাঁচানোর স্বপ্ন দেখা হয়েছে। উভয়টির মূলকথা এদেশের কৃষকদের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন। এজন্য প্রয়োজন বাংলার চাষিদের একাংশের বিলাসিতা ত্যাগ করা। আর পল্লিবাংলার আনাচে-কানাচে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। তবেই সুখী ও সমৃদ্ধ হবে বাংলার কৃষক সমাজ। তাই বলা যায়, 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে বর্ণিত সমাজভাবনা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে
ত্রস্তা-ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

ক. 'চাষার দুক্ষু' রচনায় কৃষককন্যার নাম কী?
খ. সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় কেন?
গ. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কৃষকের সঙ্গে উদ্দীপকটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধ উভয়টিতেই শ্রমের বন্দনা গীত হয়েছে।" –স্বীকার করেন কী? বিশ্লেষণ করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. খ ১০. ক ১১. ক ১২. গ

# আহ্বান

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

## লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস একই জেলার ব্যারাকপুর গ্রাম। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা মৃণালিনী দেবী। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কাটে। অত্যন্ত মেধাবি বিভূতিভূষণ ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিকে ও ১৯১৬ সালে আইএ-তে প্রথম বিভাগে এবং ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন। তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং পাশাপশি সাহিত্যসাধনা করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যে তিনি প্রকৃতি ও মানবজীবনকে অখণ্ড সত্তায় ধারণ করেছেন। শুধু প্রকৃতির বর্ণনাই নয়, বরং তাঁর সাহিত্যে রয়েছে গভীর জীবনদৃষ্টি। তাঁর ভাষা মধুর, কাব্যধর্মী ও চিত্রাত্মক বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি *পথের পাঁচালী* ও *অপরাজিত* যুগল উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

**তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা–**

**গল্পগ্রন্থ :** *মেঘমল্লার* (১৯৩১), *মৌরীফুল* (১৯৩২), *যাত্রাবদল* (১৯৩৪), *কিন্নরদল* (১৯৩৮);

**উপন্যাস :** *পথের পাঁচালী* (১৯২৯), *অপরাজিত* (১৯৩১), *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৫), *আরণ্যক* (১৯৩৮), *দেবযান (১৯৪৪), ইছামতী (১৯৪৯)।*

## ভূমিকা

'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে। এই গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত উদার মানবিক সম্পর্কের মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মানুষের স্নেহ-মমতার কাছে যে, ধনী দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও ধর্মের বৈষম্য গুরুত্বহীন তা এই গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

## উদ্দেশ্য

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আহ্বান' গল্পটি পড়ার পর আপনি–**

- গ্রামীণ পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেখকের (কথক) সাথে গল্পে বর্ণিত বৃদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ যে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক বন্ধন সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, তা উপলব্ধি করে সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- অসহায় বৃদ্ধার চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েছি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় আমার বাবার পুরাতন বন্ধু। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন– কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা? প্রণাম করে পায়ের ধূলা নিলাম। বললেন– এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়িঘর করবে না?

–আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই–

–তাতে কী? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কী? আমি খড় বাঁশ দিচ্ছি, চালাঘর তুলে ফেল, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো।

আরও অনেকে এসে ধরল, অন্তত খড়ের ঘর ওঠাতে হবে। অনেক দিন পরে গ্রামে এসে লাগছে ভালোই। বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা, ডান হাতে নড়ি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে– বোধ হয় বাজারের দিকে চলেছে।

বুড়িকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

–বাজারে বাবা।

বুড়ি আমায় ভালো না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরল। বলল, কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

–চিনবে না। আমি অনেক দিন গাঁয়ে আসি নি।

–তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না। তিনি থাকতি অভাব ছিল না কোনো জিনিসের। গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু।

–তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, বুড়ি?

–আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বললাম, তোমার ছেলে আছে?

–কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাত-জামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। আমার বড্ড কষ্ট। ভাত জোটে না সবদিন।

বুড়িকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

–ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা চুকল না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় সেই বুড়ি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি। তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী। অনেকদিন আগে মরে গিয়েছে জমির।

বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল, ও বাবা।

বোধহয় চোখে একটু কম দেখে।

বললাম, এই যে আমি এখানে।

আমার খুড়োমশায় বুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠোনের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে গেল।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার নতুন তৈরি খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়ত হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়ত।

বললাম, কী বুড়ি, ভালো আছ?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বলল, আমার কি মরণ আছে রে বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও আম কিসের।

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে আলাম। গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি, খেয়ে দেখ এখন।

বড় ভালো লাগল। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই। একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাই নি বাল্যকালে মা-পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে।

বুড়ি বললে, খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?

–খুড়ো মশায়ের বাড়ি।

–বেশ যত্ন করে তো ওনারা?

–তা করে।

–দুধ পাচ্ছ ভালো?

–ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

–ও বাবা, ওর দুধ! অর্ধেক জল– দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝেচি।

পরদিন সকাল হয়েছে সবে, বুড়ি দেখি উঠোনে এসে ডাকছে, অ গোপাল।

বিছানা ছেড়ে উঠে বললাম, আরে এত সকালে কী মনে করে। হাতে কী?

বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি।

–সে কী! দুধ পেলে কোথায় এত সকালে?

আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ব্যাটার বউ। তারও কেউ নেই। মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েছিলাম, বলি বউ আমার, গোপাল দুধ খেতি পায় না। তাই আজ ভোরে উঠে দেখি আমারে ডাকচে, মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও।

–আচ্ছা কেন বলতো তোমার এসব! এ রকম আর কখনও এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বল। কতটা দুধ?

বুড়ি একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা, পয়সা কেন?

–পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়?

–ওই যে, বললাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ি থেকে।

–তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরিব লোক।

বুড়ি পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে দমে গিয়েছে তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারলাম। মনে একটু কষ্ট হলো বুড়ি চলে গেলে। পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি? বুড়ির কী রকম হয়ত মন পড়ে গিয়েছে আমার ওপর, স্নেহের দান– এমন করা ঠিক হয়নি। বুড়ি কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখল না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে এসে জুটবে।

–অ গোপাল, এই দুটি কচি শসার জালি মোর গাছের, এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিকিন মোর সামনে?

–বুড়ি তোমার চলে কিসে?

–ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমায় দুটো না দিয়ে খায় না।

–একা থাক?

–তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুর পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েছিলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি।

সেবার বুড়ির বাড়িতে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। নানাদিকে ব্যস্ত থাকি। অনেক দিন পরে গ্রামে এসেছি তো? যে কদিন গ্রামে থাকি বুড়ি রোজ সকালে আসতে ভুলবে না। কিছু না কিছু আনবেই। কখনো পাকা আম, কখনো পাতি লেবু, কখনো বা একছড়া কাঁচকলা কি এক-ফালি কুমড়ো।

পুনরায় গ্রামে এলাম পাঁচ-ছয় মাস পরে, আশ্বিন মাসের শেষে। কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে; বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ির সঙ্গে দেখেছিলাম সে মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বললে, বাবু কবে এসেছেন?

–দিন পাঁচ-ছয় হলো।

–কেন?

–আমার সেই মা পেটিয়ে দিলে, বলে দেখে এসো গিয়ে।

–কে?

–ও সেই বুড়ি– এখানে যিনি আসত। তেনার বড্ড অসুখ। এবার বোধ হয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে– অস্থির, আমারে রোজ শুধায়। একবার দেখে আসুন গিয়ে, বড্ড খুশি হবে তাহলি।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুয়ে আছে একটা মাদুরের ওপর, মাথায় মলিন বালিশ। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ মেলে আমার দিকে চাইল। পরে আমাকে চিনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতেই আমি বললাম, উঠো না, ও কী?

বুড়ি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, ভালো আছ অ মোর গোপাল? বসতে দে গোপালকে। বসতে দে।

–বসবার দরকার নেই, থাক।

–গোপালেরে ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে।

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মতো অনুযোগের সুরে বলতে লাগল, তোর জন্যি খাজুরের চাটাইখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরনো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তুই একদিনও এলি না গোপাল। অসুখ হয়েছে তাও দেখতে এলি না।

বুড়ির দুচোখ বেয়ে জল বেয়ে পড়ছে গড়িয়ে। আমায় বলল, গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস্।

আসবার সময় বুড়ির পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্য। হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না।

বুড়ি কিন্তু সে যাত্রা সেরে উঠল।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি। বোধ হয় দেড় বছরও হতে পারে। একবার শরতের ছুটির পর তখনও দুইদিন ছুটি হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুইদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলে? সে বুড়ি যে কাল রাতে মারা গিয়েছে। তোমার নাম করলো বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বললেন।

আমি এসেছি শুনে বুড়ির নাতজামাই দেখা করতে এল। আমার মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল সেই একদিন– আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহু দূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে। আমার মন হয়ত ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।

কাপড় কিনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল, মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন।

শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাল-লতা দোলানো একটা প্রাচীন গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল, শুকুর মিঞা, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়ত। আবেদালি, তার ছেলে গনি এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে।

প্রবীণ মুকুর মিয়া আমায় দেখে বলল, এই যে বাবা, এসো। বুড়ির মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালোবাসত বুড়ি।

দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়ছে। কবর দেওয়ার পর সকলে এক এক কোদাল মাটি দিল কবরের উপর। শুকুর মিঞা বলল, দ্যাও বাবা– তুমি দ্যাও।

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো, –অ মোর গোপাল।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অন্ধের নড়ি–** অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন। **করাতের কাজ–** কাঠ চেরাই করার পেশা। **করাতি–** করাত দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে যে। **গোলাপোরা–** গোলাভরা। **গোয়ালপোরা–** গোয়ালভরা। **চক্কোত্তী–** 'চক্রবর্তী' উপাধির আঞ্চলিক রূপ। পূজারী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। **দাওয়া–** রোয়াক, বারান্দা। **নড়ি–** লাঠি।

## সারসংক্ষেপ

'আহ্বান' একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প। এ গল্পটিতে কথক ও গ্রামের এক দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধার আত্মিক বন্ধনের চিত্র প্রতিভাত হয়েছে। দরিদ্র হলেও বৃদ্ধা কখনো কথকের কাছে খালি হাতে যান না। বৃদ্ধার স্নেহের টান যেন তার আত্মার টানকেই প্রকাশ করে। জাতিগত বিভেদ ও চিত্তের বৈষম্য উভয় হৃদয়ের সম্পর্কের পথে বাধা হতে পারে না। স্নেহবশে বৃদ্ধা তার জন্য কখনো আম, কখনো শসা, জালি, দুধ প্রভৃতি নিয়ে আসে। এভাবে বৃদ্ধার প্রতি কথকের হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়।

একদিন অসুস্থ হলে বৃদ্ধাকে কথক দেখতে যান। বৃদ্ধা সনাতন ধর্মানুসারী কথককে বসতে দেয়ার জন্য একটি খেজুর পাতার চাটাই বুনে রেখেছিল। অশ্রুসিক্ত বৃদ্ধা মৃত্যুর পর তাকে দাফনের জন্য কাফনের কাপড়টি কিনে দিতে কথককে অনুরোধ করে। বৃদ্ধার মৃত্যুর পর কথক এক প্রকার মনের টানেই যেন গ্রামে আসে। বৃদ্ধার কাফনের কাপড় কেনার জন্য কথক তার আত্মীয়ের হাতে টাকা দেন। ধর্মবর্ণবিত্ত প্রভৃতিকে ছাপিয়ে মানুষের মহিমাই প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পটিতে। লেখক এতে লোকায়ত গ্রামীণ জীবনধারা যে শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে অনেকটা মুক্ত তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. বুড়ির স্বামীর নাম কী?**

ক. আবেদালি　　খ. শুকুর আলি
গ. জমির　　ঘ. পরশু সর্দার

**২. গোপালের বুড়িকে ভাল লাগার কারণ কী?**

ক. একই গ্রামে বসবাস　　খ. রক্ত সম্পর্ক
গ. মা বলে ডাকায়　　ঘ. আদরের সম্বোধনে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

শমি দীর্ঘদিন ধরে বিলাত প্রবাসী। দেশের সঙ্গে তার নাড়ীর টান ছিন্ন হয়নি। ছুটি পেলেই সে একেবারে গ্রামের বাড়ি চলে আসে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার উদার মানবিক সম্পর্ক। তারা শমিকে কাছে পেয়ে গর্ববোধ করে।

**৩. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন রচনার মিল রয়েছে?**

ক. অপরিচিতা　　খ. বিড়াল
গ. আমার পথ　　ঘ. আহ্বান

**৪. উদ্দীপক ও পঠিত গল্প অনুসারে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠে–**

ক. গ্রামীণ পরিবেশে　　খ. যোগাযোগের কারণে
গ. দান-ধ্যানের কারণে　　ঘ. পারস্পরিক সহমর্মিতায়

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৫. গোপাল গ্রামে এলে কার বাড়িতে থাকে?**

ক. শুকুর মিঞা　　খ. চকোত্তি মশায়
গ. বন্ধু　　ঘ. বুড়ি

**৬. বুড়ি ঘাবড়ে গিয়েছিল কেন?**

ক. দুধের দাম দেওয়ায়　　খ. দুধের দাম চাওয়ায়
গ. দুধের দাম না চাওয়ায়　　ঘ. দুধের দাম না দেওয়ায়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ছোট খালার উপর অভিমান ছিল। তাই বড় অসুখ করলেও তাকে দেখতে যাওয়া হয়নি। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার তাকে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বিছানা থেকে ওঠে বসলেন। বললেন, "বাবারে, এতদিন পর এলি?"

**৭. উদ্দীপকের খালার সঙ্গে 'আহ্বান' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?**

ক. বুড়ি　　খ. দিগম্বরী
গ. গোপাল　　ঘ. শুকুর আলি

**৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–**

i. কষ্টবোধ
ii. অনুযোগ
iii. অভিমান

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. ii ও iii　　ঘ. iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার–
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন।
আমি জমিলার মা'র
শূন্য খাঁ খাঁ রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।

ক. 'আহ্বান' গল্পে গল্পকথক কোন মাসে দ্বিতীয়বার গ্রামে এসেছিলেন?
খ. 'স্নেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি' –বাক্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের জমিলার মা'র সঙ্গে 'আহ্বান' গল্পে কার মিল রয়েছে?

ঘ. "নিবিড় স্নেহ ও উচ্ছল ভালোবাসা উদ্দীপক এবং 'আহ্বান' গল্পের উপজীব্য।" –বিশ্লেষণ করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

বাল্যবন্ধু রাজিব হালদারের মৃত্যুর সংবাদ শুনে গ্রামে ছুটে এসেছে সাইদ মাহমুদ। শেষবারের মত বন্ধুর মুখ দেখার জন্য তার আকুলতা। বাড়ি এসে দেখে লাশ পোড়ানোর জন্য সকলে মিলে শ্মশান ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। সাইদ মাহমুদ কাল বিলম্ব না করে শবযাত্রায় জনতার সঙ্গে শরিক হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বন্ধন তা ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই গড়ে ওঠে।

ক. বৃদ্ধার কোন হাতে নড়ি ছিল?

খ. 'আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা।' –কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'আহ্বান' গল্পে কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ঘ. "আহ্বান' গল্পের উদার মানবিক চেতনা উদ্দীপকেও অনুরণিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

'আহ্বান' গল্পে গল্পকথক জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয়বার গ্রামে এসেছিলেন।

**খ.**

'স্নেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি' –বাক্যটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বুড়ির স্নেহের দান অর্থ দিয়ে পরিশোধ করতে যাওয়া গল্পকথকের উচিত হয়নি।

'আহ্বান গল্পে জমির করাতির স্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধা। দেখাশোনা করার জন্য তার নিকটাত্মীয় কেউ নেই। গল্পকথকের সঙ্গে তার মমতার বন্ধন গড়ে উঠে। এ কারণে জমির করাতির স্ত্রী বুড়ি গল্পকথকের জন্য প্রতিদিন সকালে কিছু না কিছু নিয়ে আসত। বুড়ি একদিন জানতে পারে গল্পকথক খাঁটি দুধ খেতে পাচ্ছেন না। তাই সে একদিন গল্পকথকের জন্য দুধ জোগাড় করে নিয়ে আসে। এ নিয়ে লেখক বেশ বিব্রতবোধ করেন।

**গ.**

উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিলার মা 'আহ্বান' গল্পে বুড়ি চরিত্রটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রামবাংলায় প্রাচীনকাল থেকে যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল তেমনি এর বিপরীতে দারিদ্র্যের করালগ্রাসও দুর্লক্ষ্য নয়। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়াতে এখানকার মানুষকে জীবননির্বাহের জন্য কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে পরিবারে পুরুষ সদস্যের অবর্তমানে নেমে আসে অভাব, কখনোবা বিপর্যয়।

উদ্দীপকে জমিলার মা বাংলার গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি। তার রান্নাঘর প্রায় সময়ই শূন্য থাকে। ঘরে রান্না হয় না, তাই থালা- বাসনও শুকনো থাকে। উদ্দীপকের কবি মূলত এখানে একটি চিত্রকল্পের সাহায্যে জমিলার মায়ের আর্থিক দূরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। 'আহ্বান' গল্পেও লেখক তার গ্রামের এক দরিদ্র বুড়ির কথা বলেছেন। বুড়ি জমির করাতির স্ত্রী। তাকে মা ডাকে এমন এক মহিলার সঙ্গে সে থাকে। বিধবা বুড়ির নাতজামাই আছে, সে তাকে খেতে দেয় না। তার যত্ন করে না। বুড়ির তাই ভারি কষ্ট। একমুঠো ভাতের জন্য তাকে সারাদিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয়। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের জমিলার মায়ের সঙ্গে 'আহ্বান' গল্পের বুড়ি চরিত্রের সামঞ্জস্য রয়েছে।

**ঘ.**

নিবিড় স্নেহ ও উচ্ছল মানবিক সম্পর্ক উদ্দীপক এবং 'আহ্বান' গল্প উভয়টির পরতে পরতে চিত্রিত হয়েছে।

মানুষের পারস্পরিক স্নেহ ও মমতার বন্ধন বিষয়টি আত্মিক। মানুষ মানবিক চেতনায় একে অন্যকে ভালবাসে। কোন কারণে সহানুভূতির প্রশ্রয় পেলে মানুষের হৃদয়ে জমে থাকা কষ্টগুলো দূর হয়ে যায়। মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে, একজন

আরেক জনের সঙ্গে গভীর সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলবে, এটাই স্বাভাবিক। এভাবে পরস্পরের সঙ্গে গড়ে উঠে নিবিড় স্নেহ ও উচ্ছল মানবিক বন্ধন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি জন্মভূমির সাথে তাঁর নিজের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেছেন। গ্রামে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে রক্ত, আত্মীয়তা, পড়শী ও আন্তরিকতার সূত্রে পরস্পর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। উদ্দীপকে একজন অকালবৃদ্ধ ও অভাবগ্রস্ত নারীর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে মানবিক ভালবাসায় আবদ্ধ মানুষের জীবনাচরণ ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে 'আহ্বান' গল্পে এক অসহায় বুড়ির গভীর মাতৃস্নেহের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গ্রামে বুড়ির আপন বলতে কেউ নেই। তার খোঁজ-খবর কেউ তেমন একটা নেয় না। প্রতিবেশী যে স্ত্রীলোকটিকে বুড়ি মেয়ে বলে ডাকে সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে উপার্জন করে বুড়িকে নিয়ে খায়। এমনি এক পর্যায়ে লেখকের সঙ্গে বুড়ির পরিচয় হয়। বুড়ি লেখককে সন্তানের মত স্নেহ করে। লেখকও তার প্রতি যতটা সম্ভব মমত্ববোধ প্রকাশ করেন।

উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে উদার মানবিকতা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকে গ্রামীণ জীবনে একে অপরের আন্তরিকতাপূর্ণ চেনাজানার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার উচ্ছলতা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে। 'আহ্বান' গল্পেও লেখক দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফিরে আসায় নিবিড় স্নেহ তার জীবনে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই স্নেহ নিবিড়তাই 'আহ্বান' গল্পের মূল সুর যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বাল্যকালে বাবা-মাকে হারিয়ে ফুফুর নিকট বড় হয় রোকন। আজ সে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। ব্যস্ততার কারণে গ্রামের বাড়িতে খুব একটা আসা হয়ে উঠে না। সংসারে যশ, খ্যাতি, অর্থ সকলই তার করায়ত্ত। শুধু সময় হয়ে উঠে না ফুফুকে এক নজর দেখার। রোকনের ফুফু একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন । অনাদর, অবহেলা এবং চিকিৎসার অভাবে ফুফু গত বছর চলে গেছেন না ফেরার দেশে। রোকন তখন বাড়ি গিয়েছিল কেবল সামাজিকতা রক্ষার্থে।

ক. করাতি কাকে বলে?

খ. 'কেউ নেই বাবা, কেউ নেই।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'আহ্বান' গল্পের সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে রোকন ও 'আহ্বান' গল্পে গোপাল চরিত্রের মধ্যে চেতনাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।" –আলোচনা করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. ঘ

# আমার পথ

## কাজী নজরুল ইসলাম

## লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কিছুদিন মসজিদে ইমামতিও করেন। *সাপ্তাহিক বিজলি* পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নজরুলের উপন্যাসগুলোর পটভূমি গড়ে উঠেছে বিপ্লব ও স্বাধীনতা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। দেশপ্রেম এবং নির্যাতিত মানুষের কথা উপন্যাসগুলোতে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নজরুলের ছোটগল্প বেশিরভাগই প্রেমকেন্দ্রিক। তিনি মূলত যৌবনের কবি। যৌবনের ধর্মই হল একদিকে যেমন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ, অন্যদিকে প্রেম। এ দুটো অনুভূতিরই সূচনা হয় আবেগের প্রাবল্য থেকে। নজরুলের ভাষণ, সম্পাদকীয়, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষার কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ। তিনি *দৈনিক নবযুগ*, *ধূমকেতু* ও *লাঙল* পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেছেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। কবিকে ঢাকা ও রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' ও বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। **কাজী নজরুল ইসলামের প্রধান সাহিত্যকর্ম :**

**কাব্যগ্রন্থ** : *অগ্নিবীণা* (১৯২২), *বিষের বাঁশী* (১৯২৪), *ছায়ানট (১৯২৪)*, *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *সর্বহারা* (১৯২৬), *সিন্ধু-হিন্দোল* (১৯২৭), *চক্রবাক* (১৯২৯), *ফণি-মনসা* (১৯২৯), *প্রলয়-শিখা* (১৯৩০);

**উপন্যাস** : *বাঁধনহারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), *কুহেলিকা* (১৯৩১);

**গল্পগ্রন্থ** : *ব্যথার দান* (১৯২২), *রিক্তের বেদন* (১৯২৫), *শিউলিমালা* (১৯৩১);

**প্রবন্ধগ্রন্থ** : *যুগবাণী* (১৯২২), *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৩), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬), *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৬)।

## ভূমিকা

'আমার পথ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি'র প্রত্যাশা করেছেন যে সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও অসংকোচ। একই সঙ্গে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে 'আমরা' করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি পরনির্ভরতা ও সংকোচ থেকে বের হয়ে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রীতি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে উৎকৃষ্ট মানব সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

## উদ্দেশ্য

**কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার পথ' প্রবন্ধটি পড়ার পর আপনি–**

- 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসরণে নজরুলের ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নজরুল 'আমার সত্য' বলতে কী বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করতে পারবেন।
- দেশ উদ্ধার করতে হলে আত্মনির্ভরতার প্রয়োজন কেন হয় সে-সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- 'মানবধর্মই যে সবচেয়ে বড় ধর্ম' প্রবন্ধটির আলোকে তা বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি– নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়। রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমার বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সে-ই বাইরে ভয় পায়। এতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না– অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে, নিজকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহংকার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদিই এটাকে কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো– অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নিচু করে আনে। ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন।

স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, "আমি আছি" এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম "গান্ধীজি আছেন"। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার দম্ভ– আর যাই হোক ভণ্ডামি নয়। এ-দম্ভ শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার' –ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জনা! আমার এমন গুরু কেউ নেই, যার খাতিরে সে আগুন-সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে। আমি সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য বলে মনে নেব না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ আমি কোনো দিনই করব না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিভাতে পারবে। তাছাড়া কেউ নিবাতে পারবে না।

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশ্‌মনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অভিশাপ-রথের সারথি–** সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে। **আগুনের ঝাণ্ডা–** অগ্নিপতাকা, আগুনে সব শুদ্ধ করে নিয়ে সত্যের পথে ওড়ানো নিশান। **কর্ণধার–** প্রধান নেতা, যিনি হাল ধরেন। **কুর্নিশ–** অভিবাদন, সম্মান প্রদর্শন। **মেকি–** মিথ্যা, কপট। **সম্মার্জনা–** মেজে ঘষে পরিষ্কার করা।

## সারসংক্ষেপ

'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম এমন এক 'আমি'র আগমন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ, সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক, অসংকোচ। তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ 'আমি' করতে চেয়েছেন, আর এভাবে প্রত্যেককে সংযোগ করে 'আমরা' হয়ে উঠতে চেয়েছেন। তাঁর এ ভাবনা সত্যপথের পথিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। নজরুলের এই 'আমি সত্তা' মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আদলে নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে। নজরুল বলেছেন সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা। কবি ভগ্ন আত্মাবিশ্বাসের পরিবর্তে দাম্ভিক হতে চান। কারণ তাঁর বিশ্বাস সত্যের দম্ভ যাদের আছে তাদের জন্য অসাধ্য সাধন করা কঠিন কাজ নয়। তিনি ভুল করতে রাজি আছেন, কিন্তু ভণ্ডামি করতে রাজি নন। তাঁর কাছে নিজেকে জানাই হল সত্যকে জানা, আর এই সত্যকে জানার মাধ্যমে মানুষ দাঁড়াতে পারে তার অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে। নজরুল বলেছেন, মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে পারলেই ধর্মের প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। সমগ্র মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. মহাত্মা গান্ধী আমাদের কী শিখিয়েছিলেন?**

ক. আত্মপ্রত্যয় খ. স্বাবলম্বন
গ. নিষ্ঠুরতা ঘ. বিনয়

**২. মানুষের অমর্যাদা হয় কিসে?**

ক. অন্তরের ভয়ে খ. মিথ্যা বিনয়ে
গ. বাইরের ভয়ে ঘ. আত্মঅহংকারে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

আপন খবর আপনার হয় না
একবার আপনারে চিনলে

যায় অচেনারে চেনা
ও যার আপন খবর আপনার হয় না।

**৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে রচনার–**

ক. বিড়াল | খ. আহ্বান
গ. আমার পথ | ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

**৪. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–**

i. সত্যকে জানা
ii. নিজেকে জানা
iii. অজানাকে জানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. i ও ii | ঘ. iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৫. 'কুর্নিশ' শব্দের অর্থ কী?**

ক. শুভেচ্ছা জানানো | খ. ছোট হওয়া
গ. অভিবাদন | ঘ. অসম্মান প্রদর্শন

**৬. সকল ভয়কে কীভাবে দূর করা যায়?**

ক. সত্যকে অর্জন করে | খ. আত্মনির্ভরশীল হয়ে
গ. ক্ষমতা দখল করে | ঘ. সাহস অর্জন করে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

**৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার পথ' রচনার যে ভাবটির মিল রয়েছে –**

i. সত্য বিভ্রান্ত করে
ii. সত্য আলোর দিশারী
iii. সত্যের পথ অন্ধকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. iii | ঘ. i ও iii

**৮. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বৈশিষ্ট্যটি উপস্থাপিত হয়েছে–**

i. আত্মপ্রত্যয়
ii. সত্যানুসন্ধান
iii. দাম্ভিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. ii
গ. iii | ঘ. i ও ii

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম- কানুন, বাঁধন- শৃঙ্খল, মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনারে চিনতে হবে, বুক ফুলিয়ে বলতে হবে– 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'

ক. মানুষের মধ্যে কখন নির্ভরতা আসে?

খ. 'আমার কর্ণধার আমি।' –উক্তিটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ভাবনা 'আমার পথ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "আত্মশক্তির জাগরণই স্বাধীনতা অর্জনের পাথেয়।" –উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুযায়ী আত্মাকে চিনলেই মানুষের মধ্যে নির্ভরতা আসে।

**খ.**

নিজের উপর নিজের আস্থা থাকলে যে কোন কাজ সহজে করা যায় বলে আলোচ্য মন্তব্যটি করা হয়েছে।

আমরা সমাজে বাস করি। সমাজে চলতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় এককে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তখন আমাদের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব থাকে না। এই নির্ভরশীলতা স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এক সময় এই নির্ভরতা অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। বস্তুত 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম 'আমার কর্ণধার আমি।' বলতে মানুষের আত্মনির্ভরতা তথা আত্মশক্তিকে বুঝিয়েছেন।

**গ.**

আত্মশক্তি উন্মোচনের বিষয়ে উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানুষ যখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সত্যশক্তিতে উদ্দীপিত হয় তখন সে যে কাজে অগ্রসর হবে তাতেই সাফল্য লাভ করবে।। আত্মবিশ্বাসী মানুষ নিজের উপর আস্থা রাখতে পারে। সে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। একজন মানুষ আত্মবিশ্বাস, সত্যশক্তি ও মহৎ চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে কাজ করে তা দ্বারাই সে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে বিদ্রোহ করতে হবে। এই বিদ্রোহ হচ্ছে সমাজে প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বাধা- নিষেধের বিরুদ্ধে। কিন্তু নিয়ম ভাঙার এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির প্রয়োজন। এই আত্মশক্তি অর্জন করতে হলে আগে নিজেকে জানতে হবে। আর এই সঙ্গে অপরকে ব্যক্তিত্বহীনভাবে কুর্নিশ করার মত নিচু মানসিকতাকে ত্যাগ করতে হবে। 'আমার পথ' প্রবন্ধেও মানসিক শক্তির উদ্বোধনের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে সত্যের অমিত শক্তি মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে। এর ফলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে, সুন্দর ও মঙ্গলকে কামনা করতে পারে।

**ঘ.**

মানুষ যখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয় তখন স্বাধীনতার স্পৃহা তার চেতনায় জাগ্রত হয়।

মানুষের চেতনায় আত্মসত্তা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এর ভেতর লুকিয়ে থাকে অপরিমেয় শক্তি। মানুষের মধ্যকার এই আত্মসত্তার জাগরণ ঘটলে সমাজে যে কোন পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। এভাবে আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে একসময় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাও অর্জন করা যেতে পারে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে আমিত্বের জাগরণ। কারণ এত বড় একটি প্রাপ্তি অর্জন করতে হলে অপরিমেয় শক্তি থাকতে হবে। একারণে আপনাকে চিনতে হবে। আর আত্মশক্তির সন্ধান করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

মনে আত্মবিশ্বাস থাকলে অন্যকে কুর্নিশ করার প্রবণতা থাকে না, এর বদলে থাকে আত্মমর্যাদাবোধ। মানুষ যদি এই আত্মমর্যাদাবোধের সত্যে উপনীত হতে পারে তাহলে একসময় স্বাধীনতা আসবে। 'আমার পথ' প্রবন্ধেও বলা হয়েছে আমাদের আত্মনির্ভরতা যেদিন আসবে কেবল সেদিনই আমরা স্বাধীন হব। সেইসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রত্যাশা করেছেন সব বাধা অতিক্রম করে পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করার সম্মিলিত প্রয়াস।

উদ্দীপক এবং 'আমার পথ' প্রবন্ধ উভয়টিতে আত্মবিশ্বাসের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিজেকে জানা ও চেনা, নিজের অন্তরের সত্যকে কর্ণধার হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃঢ়তা ও আমিত্বে রয়েছে অপরিমেয় শক্তি। এভাবে আমিত্বের জাগরণে আসে আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসে স্বাধীনতা। এই ধারাক্রম অর্জনের প্রথম ধাপ হল আমিত্বের জাগরণ। তাই বলা যায়, আমিত্ব তথা আত্মশক্তির জাগরণই হল স্বাধীনতা অর্জনের পাথেয়।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বাস্তবিক, ভুল আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর। ভুল না থাকলে পৃথিবীর দয়া, মায়া, ক্ষমা, ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল গুণগুলির এত অবকাশ ও বিকাশ হতো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভুল না থাকলে এত দিন মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি কবে রুদ্ধ হয়ে সমস্ত অসাড় নিস্পন্দ হয়ে যেত। এখানেই ভুলের মূল্য।

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

খ. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।' –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের 'ভুলের ব্যঞ্জনা'র সাদৃশ্য আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোকিত পৃথিবীর স্বপ্ন।" –স্বীকার করেন কি? বিচার করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. গ

# জীবন ও বৃক্ষ

## মোতাহের হোসেন চৌধুরী

## লেখক-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল মজিদ ও মাতা ফতেমা খাতুন। শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যাওয়ায় কুমিল্লায় নানবাড়িতেই তিনি বেড়ে ওঠেন। কুমিল্লার ইউসুফ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তিনি আইএ ও বিএ পাশ করেন। ১৯৪৩ সালে বহিরাগত হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজে চাকরি করেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয় ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠির সংস্পর্শে এসে। এ কারণে তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহে যুক্তিনিষ্ঠা এবং মুক্তবুদ্ধির পরিচয় বিশেষভাবে বিধৃত। মুক্তবুদ্ধিমনা বিশেষ ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন। একজন সংস্কৃতিবান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্তবুদ্ধিদীপ্ত সরস প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল ক্লাইভ বেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বার্টান্ড রাসেলের দ্বারা। ক্লাইভ বেল-এর *Civilization* গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 'সভ্যতা' (১৯৬৫) এবং বার্টান্ড রাসেলের *Conquest of Happiness* গ্রন্থের অনুবাদ 'সুখ' (১৯৬৮) তাঁর দুটি বিশিষ্ট রচনা। তিনি তাঁর রচনায় সংস্কৃতি, ধর্ম, মানবতাবোধ ও মানুষের জীবনাচরণের মৌলিক বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত ও উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং বিচিত্র ও সুন্দরভাবে বাঁচার মধ্য দিয়ে মহত্তম জীবনের সন্ধান করেছেন। তাঁর গদ্যশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর এবং মননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন মূলত প্রবন্ধকার। গুণগ্রাহী বন্ধুরা মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলি সংকলিত করে *সংস্কৃতি কথা* (১৯৫৮) নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ সংকলন বের করেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন যুক্তিবাদী। তবে একই সাথে তিনি ছিলেন জীবনরসের রসিক। এ কারণেই বলা হয় তাঁর গদ্যরচনা 'বুদ্ধির দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন এবং স্মিতরসে স্নিগ্ধ'। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## ভূমিকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক বৃক্ষের পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে মানব জীবনের তুলনা করেছেন। অঙ্কুরোদগমের পর্যায় থেকে নানা রূপান্তর ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বৃক্ষের মতো মানব জীবনও পূর্ণতা পায়। শুধু বেঁচে থাকাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। অন্যের প্রেমে ও সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার মাঝেই জীবনে যেমন পূর্ণতা আসে তেমনি বৃক্ষও ফল, ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে তার জীবন সার্থক করে। এভাবেই লেখক এই প্রবন্ধে জীবনের সাথে বৃক্ষের তুলনা করেছেন ।

### উদ্দেশ্য

**মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি পড়ার পর আপনি–**

- বৃক্ষের জীবনের সঙ্গে কীভাবে মানুষের জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা কেন সহজ হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৃক্ষ ও নদীর জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করে বৃক্ষকে মানুষের জীবনাদর্শের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহঙ্কার। তারই চরণে তারা নিবেদিত-প্রাণ। ব্যক্তিগত অহঙ্কার, পারিবারিক অহঙ্কার, জাতিগত অহঙ্কার– এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বুলি।

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ– সূক্ষ্মবুদ্ধি উদারহৃদয় গভীরচিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ– যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধি হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়– তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।

জানি, বলা হবে : নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

উত্তরে বলব : চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনার যেমন একটা ধীর স্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এইতো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি, তাই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের

মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাই তো আত্মা। এই আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : Ripeness is all– পরিপক্বতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তু-জিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না– জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য-শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এতো মূল্য।

উপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি– জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।

বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়– প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অনুভূতির চক্ষু**– সংবেদনশীল মনের চক্ষু। **অন্তরায়**– বাধা। **অভিব্যক্ত**– প্রকাশিত। **আত্মিক**– আত্মা সম্বন্ধীয়। **আত্মবিসর্জন**– পরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন। **উপলব্ধি**– গভীর অনুভূতি। **গভীরচিত্ত**– গভীর চিন্তাচেতনা সম্পন্ন। **গূঢ় অর্থ**– প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য। **চর্মচক্ষু**– দৈহিক চক্ষু (মানসিক বা দিব্যদৃষ্টির বিপরীত)। **জবরদস্তি প্রিয়**– যে অন্যের ওপর জোর খাটাতে ভালবাসে। **জীবনবোধ**– জীবনের স্বরূপ সম্পর্কিত উপলব্ধি। **জীবনাদর্শ**– জীবনে অনুকরণের উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলো। **ডিঙানো**– লাফিয়ে পার হওয়া। **তপোবন**– তপস্যার জন্য যে বন। **তাৎপর্য**– অন্তর্নিহিত অর্থ, অন্তর্গূঢ় ভাব, মর্ম। **ধেয়ে চলা**– এগিয়ে চলা। **নতি**– আনত, নম্র, নিচের দিকে নিবদ্ধ। **নিশান**– পতাকা। **পতিত**– পড়ে যাওয়া, ঝরে যাওয়া। **পরিপক্বতা**– পূর্ণ পরিণতি। **প্রতীক**– কোন কিছুকে বা জিনিসকে বোঝানোর জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। **প্রশান্তি**– ধীর ও শান্ত ভাব। **বিকৃত বুদ্ধি**– অসৎবুদ্ধি। **বস্তুজিজ্ঞাসা**– বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন-অন্বেষা, বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ। **বিকশিত জীবন**– উন্নত ও অগ্রগতিময় জীবন। **বুলি**– গৎ–বাঁধা, যথাযথ অর্থ বহন করে না এমন কথা যা অভ্যাসের বশে বলা হয়ে থাকে। **বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান**– বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে তার ফুল ও ফল, এগুলো সে অন্যের হাতে তুলে দেয়, ফলে বৃক্ষ যুগপৎ প্রাপ্তি ও দানের আদর্শ। **মনুষ্যত্ব**– দয়া, ধর্ম, প্রেম ইত্যাদি মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। **মূল্যবোধ**– জীবনের মূল মর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা। **স্বল্পপ্রাণ**– ক্ষীণজীবী। **স্থূলবুদ্ধি**– যাদের বুদ্ধি কম বা বোকা। **সূক্ষ্মবুদ্ধি**– তীক্ষ্মবুদ্ধি বা জ্ঞানসম্পন্ন, সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা আছে এমন জ্ঞান। **সাদৃশ্য**– মিল, অনুরূপ বৈশিষ্ট্য। **সাধনা**– সাফল্য বা সিদ্ধি অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা। **সৃজনশীল**– নির্মাণ সৃষ্টিতে তৎপর। **সৃষ্টিধর্ম**– সৃষ্টি বা সৃজনের বৈশিষ্ট্য। **সহিষ্ণুতা**– সহ্য করতে পারার গুণ, সহনশীলতা। **এদের প্রধান দেবতা অহংকার**– যথাযথ বিচার–বিবেচনা ও চিন্তাচেতনাহীন লোকেরা এত গর্বোদ্ধত হয়ে থাকে যে মনে হয় যেন অহংকারই তাদের প্রধান উপাস্য বা দেবতা।

**তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ :**

প্রাচীন ভারতে মুনি-ঋষিরা বনের মাঝে আশ্রম তৈরি করে থাকতেন। সেখানেই সাধনা করতেন। আবার সেই আশ্রমে গুরুর শিষ্যদের (ছাত্র, শিক্ষার্থী) বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া হত। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ তা তার বহু রচনায় বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক নগর সভ্যতা থেকে দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবার উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরে শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রথম অবস্থায় আশ্রমের মতোই পড়াশোনা হত। তাই লেখক বলেছেন 'তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ'।

## সারসংক্ষেপ

মানুষকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই সমাজের কাজ। পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষই কেবল নিজের জন্য চিন্তা করে। তাই তারা নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তো তোলেই না, বরং অন্যের সার্থকতার পথেও বাধা সৃষ্টি করে। এ সমস্ত মানুষ সব সময় অহঙ্কারে মত্ত থাকে। মাঝে মাঝে তারা মানব প্রেমের কথাও বলে, কিন্তু তা আন্তরিকতাশূন্য।

পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা কমিয়ে এদের জায়গায় আনতে হবে উদার হৃদয়ের ব্যক্তি। যাদের উদ্দেশ্য সমাজে কেবল টিকে থাকা নয়, বরং জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিত করা। লেখকের মতে, এদের জীবনাদর্শের প্রতীক হবে সজীব বৃক্ষ। কারণ মানব জীবনের আদর্শ হিসেবে বৃক্ষের মতো জীবন্ত উপমা আর নেই। বৃক্ষের কাজ শুধু মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলা নয়, বৃক্ষকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। এ প্রবন্ধে বৃক্ষ মানুষের জীবনাদর্শের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নদীকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়, যা মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু লেখকের মতে, নদীর মতো অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। মানুষের জীবন গোপন ও নীরব সাধনা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, যা আমরা বৃক্ষের মধ্যে দেখতে পাই। পরের কল্যাণে নিজেকে গড়ে তোলার সাধনা ও চেতনার জন্য বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে লেখক বলেছেন, বৃক্ষের ন্যায় মানুষকেও জগতের কল্যাণে নীরবে ধূপের গন্ধের ন্যায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সাধনা করতে হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে বৃক্ষকে কিসের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে?**

ক. সার্থকতার　　খ. প্রশান্তির
গ. সজীবতার　　ঘ. সৌন্দর্যের

**২. জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয় কীভাবে?**

ক. প্রকৃতির দিকে তাকালে　　খ. নদীর দিকে তাকালে
গ. বৃক্ষের দিকে তাকালে　　ঘ. সমুদ্রের দিকে তাকালে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

মানুষের জীবনে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। বৃক্ষ আমাদের অকাতরে ফুল-ফল দান করে, সুশীতল ছায়া দেয়। কিন্তু মানুষ পরিণাম চিন্তা না করে অবাধে বৃক্ষনিধন করে। ফলে আজ তা পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**৩. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন রচনাটির সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. জীবন ও বৃক্ষ　　খ. বিড়াল
গ. আমার পথ　　ঘ. রেইনকোট

**৪. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–**

i. বৃক্ষের কল্যাণ সাধনে
ii. বৃক্ষের সাধনায়
iii. মানুষের বৃক্ষপ্রেমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৫. 'তপোবন- প্রেমিক' কে ছিলেন?**

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী　　ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

**৬. আত্মার উন্নতি কীভাবে সম্ভব?**

ক. আত্মার পরিতৃপ্তিতে　　খ. ত্যাগের মাধ্যমে
গ. মূল্যবোধের সহায়তায়　　ঘ. জীবনে সৌন্দর্যচর্চায়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

নিমগাছ আমাদের অনেক উপকার করে। এ থেকে আমরা ছাল-পাতা-ডাল নিয়ে নানা ঔষধ তৈরি করি। কিন্তু গাছটি আমাদের থেকে কোন যত্ন পায় না।

**৭. উদ্দীপকের সঙ্গে যে রচনার সাদৃশ্য রয়েছে–**

ক. আমার পথ
খ. জীবন ও বৃক্ষ
গ. রেইনকোট
ঘ. বিড়াল

**৮. এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে বিষয়ে–**

i. সাধনায়
ii. প্রাপ্তিতে
iii. দানে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

ভিখু নিষ্ঠুর ও বিকৃতরুচির মানুষ। তার একমাত্র দেবতা অহংকার। সে কখনো বৃক্ষের দিকে তাকায়নি। বৃক্ষের দিকে তাকালে তার জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হতো। বৃক্ষ কত নিশ্চুপ সাধনায় নিজেকে সজ্জিত করে দানের পরমানন্দ ভোগ করে। আর দানের মাধ্যমেই সে তার সাধনার সার্থকতা অর্জন করে।

ক. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনকে কিসের প্রতীক করতে চেয়েছেন?
খ. জীবনের সার্থকতার গান কীভাবে শুনতে হয়?
গ. উদ্দীপকের ভিখু চরিত্রে 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক এবং 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি মনুষ্যত্ববোধের একই তাৎপর্যকে ধারণ করে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনকে নদীর প্রতীক করতে চেয়েছেন।

**খ.**

মানুষকে পরিশুদ্ধ অন্তরে জীবনের গান শুনতে হয়।

বৃক্ষ নীরব ভাষায় আমাদের জীবনের সার্থকতার গান শোনায়। এই গান সকলে শুনতে পায় না। মানুষকে নিজের উপলব্ধি দিয়ে এই গান শুনতে হয়। নীরব ভাষার গান শুনতে হলে আগে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। পরিশুদ্ধ মনে গভীর অভিনিবেশে জীবনের সার্থকতার গান শুনতে হয়।

**গ.**

উদ্দীপকে ভিখুর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে বর্ণিত কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে। তাদের আচরণেও ভিন্নতা রয়েছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা নিষ্ঠুর ও অহমিকাপূর্ণ হয়। এরা সবসময় অন্যের কল্যাণের পথে অন্তরায়। নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতায় এরা সমাজের স্বাভাবিক বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে ভিখু নিষ্ঠুর, লোভী। আত্মঅহংকার ও লোভ তাকে সমাজে শুধু টিকে থাকতে শিখিয়েছে, জীবনকে কীভাবে বিকশিত করতে হয় তা শেখায়নি, শেখায়নি কীভাবে মানুষকে ভালবাসতে হয়। অপরদিকে মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে বলেছেন, স্বল্পপ্রাণ ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে জগৎ পূর্ণ হয়ে আছে। অপরের বিকশিত হওয়ার

পথে অন্তরায় সৃষ্টি করাই এদের কাজ। নিষ্ঠুরতা ও স্থূলবুদ্ধি এদের ঘিরে রেখেছে। এরা নিজেদের জীবনকে পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত করতে ব্যর্থ। প্রাবন্ধিকের মতে তাদের এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে প্রেমহীন একটি হৃদয়। বস্তুত এখানেই উদ্দীপকের ভিখুর সঙ্গে 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে বর্ণিত স্বার্থান্বেষী মানুষদের সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

**ঘ.**

উদ্দীপক এবং 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি মনুষ্যত্ববোধের তাৎপর্যকে ধারণ করেছে।

পরার্থে আত্মনিবেদন করতে পারাটাই মানবজীবনে সার্থকতা। বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে ফুল ও ফল। ফুলে- ফলে পরিপূর্ণতা অর্জন করে বৃক্ষ সেসব অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মানুষেরও উচিত বৃক্ষের মত সাধনা করে মানবজীবনে সার্থকতা অর্জন করা। অন্যকথায়, মানবিক মূল্যবোধে জীবনকে মহত্তম পর্যায়ে উন্নীত করা।

উদ্দীপকে ভিখু একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। সে সমাজে শুধু টিকেই আছে, তার জীবনের কোন বিকাশ নেই। তার মনে অপরের জন্য কোন করুণা নেই। তবে সে যদি একটি বৃক্ষের দিকে তাকাত তবে বুঝতে পারত জীবনের অর্থ, খুঁজে পেত বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। মানবপ্রেমে উৎসাহিত হয়ে সে অপরের কল্যাণে নিজেকে প্রস্তুত করত। এভাবেই সে বুঝতে পারত জীবনের তাৎপর্য। অন্যদিকে 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মানব জীবনকে সফল ও সার্থক করে গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে পরার্থে আত্মনিবেদিত জীবনই প্রকৃত মানুষের জীবন। প্রাবন্ধিক জীবনের এই কাঠামোকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা।

উদ্দীপকে বৃক্ষের নীরব সাধনার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পরহিত ব্রতের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধেও বৃক্ষের ফুল ফোটা ও ফলে সজ্জিত হওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্বের স্থান নির্ধারিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক এবং 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি মনুষ্যত্ববোধের তাৎপর্য বহন করে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বৃক্ষের ভিতর আরও একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরের কত পরিবর্তন ঘটিতেছে কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পুনর্জীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা অনাবশ্যক জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ক. গোপন ও নীরব সাধনা কিসে অভিব্যক্ত হয়?

খ. অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয় কেন?

গ. উদ্দীপকে 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের মূলভাবকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করেনি।" –মূল্যায়ন করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. ঘ ৭. খ ৮. ঘ

# মাসিপিসি

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

## লেখক-পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালের ১৯ মে ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতার চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তাঁর ডাকনাম মানিক এবং পিতার দেয়া নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতার সরকারি চাকরির কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা করেন। এরপর অংকশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এ সময়েই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসী মামী', যা ছাপা হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। বিচিত্রা-য় গল্প প্রকাশের পর থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন সার্বক্ষণিক লেখক। ফলে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে বিজ্ঞানী হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে। শেষ অবধি সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক রূপেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ মার্কসবাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৪৪ সালে তিনি লাভ করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। তিনি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। সর্বমোট ৩৯টি উপন্যাস ও প্রায় তিনশো ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর *পুতুল নাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) ও *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর অন্যতম। মনোবিশ্লেষণ, বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টি, সাম্যবাদে আস্থা এবং মানুষের মধ্যকার সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মূল প্রেরণা। ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম :**

**উপন্যাস** : জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), অহিংসা (১৯৪১), চিহ্ন (১৯৪৭), হরফ (১৯৫৪);

**ছোটগল্প** : প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০);

**প্রবন্ধ** : লেখকের কথা (১৯৫৭)।

## ভূমিকা

'মাসিপিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬), পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক রচনাবলির পঞ্চম খণ্ড থেকে। নিঃস্ব ও বিধবা দুই নারী স্বামীর নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর অস্তিত্ব রক্ষায় যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে তা এই গল্পটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের লালসা, দুর্ভিক্ষের স্মৃতি ও জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম এ গল্পের বৈচিত্র্যময় দিক।

## সাধারণ উদ্দেশ্য

**মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাসিপিসি' গল্পটি পড়ার পর আপনি–**

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর জীবন কীভাবে স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তা জানতে পারবেন।
- সামাজিক নির্মমতা থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য তার বিধবা ও নিঃস্ব মাসিপিসি'র বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী ভূমিকার কথা জানতে পারবেন।

# পাঠ-১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- কৈলাশ ও মাসিপিসির কথোপকথনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- আহ্লাদির নির্যাতনকারী স্বামী জগুর সংসার ছেড়ে চলে আসার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, গোরা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দু-হাত চওড়া হয় কি না হয়। দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

'মাসিপিসি ফিরছে কৈলেশ', বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসিপিসির সালতি দু-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

"ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।"

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসিপিসি সালতির গতি ঠেকায়, আহ্লাদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, 'বেলা আর নেই কৈলেশ।' পেছনে থেকে পিসি বলে, 'অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ'। মাসিপিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে বলা। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদি যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

'বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি', কৈলাশ শুরু করে, 'মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো–'

মাসি বলে, 'খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দাকথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে কী?'

পিসি বলে, 'খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।'

মাসিপিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, 'জগুর সাথে দেখা হলো কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এটটু-মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।'

মাসি বলে, 'চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী?'

পিসি বলে, 'সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?'

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদির দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে, তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসিপিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে 'ওসব একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সেই জগু নেই। বউকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।'

মাসি বলে, 'পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে দিনভর রাতভর?'

পিসি-বলে, 'মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই-আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?'

মাসি বলে, 'ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।'

পিসি বলে, 'নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।'

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আহ্লাদির দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোর-জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আহ্লাদির সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদির ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের চাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদির দিকে।

কৈলাশ বলে, 'তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্য। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জান মাসি, জান পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

আহ্লাদি একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কয়েক বার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, 'জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?'

বলে মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি!

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**কলকেপোড়া ছ্যাঁকা–** তামাকসেবনে ব্যবহৃত হুকার উপরে কলকেতে থাকে যে আগুন তা দিয়ে দগ্ধ করা। **কদমছাঁট–** মাথার চুল এমনভাবে ছাঁটা যে তা কদমফুলের আকার ধারণ করে। **খপর–** 'খবর' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। **খুনসুটি–** হাসি-তামাশাযুক্ত বিবাদ বা ঝগড়া। **পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা–** পর্যাপ্ত খাবার না জুগিয়ে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি লাথি ঝাঁটার মাধ্যমে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা। **বেমক্কা–** স্থান-বহির্ভূত, অসংগত। **মেয়া–** 'মেয়ে' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। **লগি–** হাত ছয়েক লম্বা সরু বাঁশ। নৌকা চালানোর জন্য ব্যবহৃত বাঁশের দণ্ড। **সালতি–** শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা। **সোমত্ত–** সমর্থ (সংসারধর্ম পালনে), যৌবনপ্রাপ্ত।

## সারসংক্ষেপ

এ গল্পে স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তরুণী আহ্লাদির মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। মাসিপিসি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রতিকূল পৃথিবী থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। আহ্লাদির স্বামী জগু মদ্য পান করে। স্ত্রীর ওপর চালায় নিয়মিত নির্মম শারীরিক নির্যাতন। নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাসিপিসি আহ্লাদিকে জগুর সংসার থেকে ফিরিয়ে আনে। আর কিছুতেই যেতে দেয় না। জগু তার স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য কৈলাশকে দিয়ে মাসিপিসিকে জেলের ভয় দেখায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের এই অংশে দুজন বৃদ্ধার জীবন সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে নিষ্পেষিত তাদের জীবন, দু-বেলা খাবার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে তারা। তার উপর আহ্লাদির বোঝা। তার পরও তারা আহ্লাদিকে ভালবাসে। মদ্যপ স্বামীর কাছে আহ্লাদিকে ফিরিয়ে না দিতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. আহ্লাদির স্বামীর নাম কী?**

ক. জগু　　খ. কৈলাশ
গ. কানাই　　ঘ. গোকুল

**২. 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো।' –বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

ক. মেয়ের প্রতি ভালবাসা　　খ. মেয়ে জামাইয়ের প্রতি ভালবাসা
গ. মেয়ে জামাইয়ের প্রতি ঘৃণা　　ঘ. নাত জামাইয়ের প্রতি ভালবাসা

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

বন্যা পরবর্তী সময়ে গ্রামটিতে আকাল পড়েছে। লতিফা তার দুধের সন্তানকে বলতে গেলে একরকম অনাহারেই রেখেছে। খাদ্য যোগাড় করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

**৩. উদ্দীপকের লতিফার সঙ্গে 'মাসিপিসি' গল্পে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. মসি-পিসি　　খ. আহ্লাদি
গ. কৈলাশ　　ঘ. জগু

**৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–**

i. জীবনসংগ্রাম
ii. অস্তিত্ব-সংকট
iii. বন্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

# পাঠ-২

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- আহ্লাদিকে নিয়ে মাসিপিসির সংগ্রামী জীবনের চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাসিপিসির বিরোধ অবসানের কারণ কী, তা লিখতে পারবেন।
- দারোগাবাবুর প্রতিনিধি কানাইকে মাসিপিসি কীভাবে মোকাবেলা করেছিল তা লিখতে পারবেন।

## মূলপাঠ

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদির। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসিপিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন– খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রূপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদির বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসিপিসির সেবা-যত্নেই আহ্লাদি অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি–বা সম্ভব, অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসিপিসি আহ্লাদির জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে না–পেল যদি তো না–খেয়েই। অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারদিকে না-খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি; একদিন মাসি বলে পিসিকে, 'একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।'

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয়ত মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসিপিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসিপিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখ-দুঃখের কথা তারা কাকেই-বা বলবে, কেই-বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদির ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদি আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল

থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদিকে হয়ত শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো, মাসিপিসিও বিশেষ কিছু বলতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসিপিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আহ্লাদিকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদিকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদিকে বর্তেছে, জগুর বৌ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদিকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনের মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদিকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, 'ডরাস্‌নি আহ্লাদি। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয় তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?'

পিসি বলে, 'দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলি নি কৈলেশকে।'

মাসি বলে, 'চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা। মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।'
পিসি বলে, 'ছেলে মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদি। তোর পিসে ছিল জগুর মতো। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে।

মাসি বলে, 'তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদি, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।'

পিসি বলে, 'তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের?'

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসিপিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদির পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসিপিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসিপিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসিপিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কি না যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কত রকমের দর দিয়েছে মাসিপিসির কাছে। মাসিপিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসিপিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসিপিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসিপিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদি। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসিপিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদিকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সহজ হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদির কথা, আহ্লাদির সুখদুঃখ, আহ্লাদির সমস্যা আহ্লাদির ভবিষ্যৎ। জমাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসিপিসি– আহ্লাদিকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসিপিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিঃশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তেলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু-জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসিপিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসিপিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।'

মাসি বলে, 'এত রাতে?'

পিসি বলে, 'মরণ নেই?'

কানাই বলে, 'দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবেগো দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

মাসিপিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসিপিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটি-বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদিকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, 'মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?'

পিসি বলে, 'আমি যাই বলো?'

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসিপিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, 'কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।'

পিসি বলে, 'হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।'

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, 'কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে লজ্জা করে। কাল সকালে যাব।'

পিসি বলে, 'এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?'

কানাই ফুঁসে ওঠে, 'না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালো, ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।'

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, 'বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।'

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, 'বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বাঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।'

পিসি বলে, 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।'

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসিপিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসিপিসির।

মাসি বলে, 'শোনো কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েনোক পারব না জানি কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জখম করব ঠিক।'

পিসি বলে, 'মোরা নয় মরব।'

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসিপিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনাদ্দন! ওগো কানুর মা!, বিপিন!, বংশী ...,

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদিকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসিপিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হলো সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, 'জানো বেয়াইন, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি।'

পিসি বলে, 'তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।'

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে।

মাসি বলে, 'সজাগ রইতে হবে রাতটা।'

পিসি বলে, 'তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।'

আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদির ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদির বাপের আমলের গোরুটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসিপিসি।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**এর্কি–** 'ইয়ার্কি' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ, হাস্য-পরিহাস বা রসিকতা। **কাটারি–** কাটবার অস্ত্র। **ডালের বড়ি–** চালকুমড়া ও কলাইয়ের ডাল পিষে ছোট ছোট আকারে তৈরি করা খাদ্যবস্তু যা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং সবজি-মাছ-মাংসের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়। **পাঁশুটে–** ছাইবর্ণবিশিষ্ট, পাংশুবর্ণ, পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে। **বাজারের তোলা–** বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করা খাজনা। **ব্যঞ্জন–** রান্না-করা তরকারি । **সড়গড়–** রপ্ত, মুখস্থ, অভ্যস্ত, স্মৃতিগত।

## সারসংক্ষেপ

জগুর অত্যাচারে আহ্লাদি বাবার বাড়ি চলে যায়। সেখানে তার একমাত্র অভিভাবক মাসিপিসি। তারা আহ্লাদিকে সন্তানের মতো কাছে টেনে নেয়। আহ্লাদিও স্বামীর বাড়ি যেতে চায় না। কিন্তু জগু স্ত্রীকে ঘরে নিতে চায়। স্ত্রীর সম্পদের প্রতি তার লোভ আছে। আহ্লাদিকে অপহরণ করার হীন মতলবে জোতদার ও দারোগা বাবু কানাই চৌকিদারকে মাসিপিসির বাড়িতে পাঠায়। তারা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। কিন্তু মাসিপিসি তা বুঝতে পেরে চিৎকার করে লোক জড়ো করে এবং অস্ত্র হাতে দোষীদের ধাওয়া করে। আসন্ন বিপদের কথা কল্পনা করে মাসিপিসি শত্রুর আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বড় গামলাতে জল ভরে রাখে, কাঁথা আর কম্বল ভিজিয়ে রাখে, হাতের কাছে রাখে বঁটি আর দা। জীবন-সংগ্রামী এই দুই নারী অত্যাচারী স্বামী, জোতদার, দারোগা ও খারাপ মানুষদের হাত থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছে তা সত্যি অসাধারণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. আহ্লাদিকে পাওয়ার জন্য মাসিপিসিকে কে পাগল করে তুলেছে?**

ক. কানাই　　খ. গোকুল

গ. কৈলেশ　　ঘ. দারোগা বাবু

**৬. 'বাজারের তোলা' বলতে বোঝায়–**

ক. বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করা কর
খ. ক্রেতাদের দেয়া ক্ষতিপূরণ
গ. বিক্রেতাদের লাভের অংশ
ঘ. ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থ

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

আহারে। এরে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইণ্যা, দরজা খোল, মারিস না, আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দু'হাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকাল সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুলল না।

**৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মাসিপিসি' গল্পে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. কৈলেশ
খ. জগু
গ. কানাই
ঘ. গোকুল

**৮. এরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হল–**

i. নারী নির্যাতনে
ii. সমাজে পুরুষতন্ত্রে
iii. নারীর অসহায়তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii, iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৯. 'সোমত্ত' শব্দের অর্থ কী?**

ক. ষণ্ডা
খ. যৌবনপ্রাপ্ত
গ. সোমবার
ঘ. শাস্তি

**১০. মাসিপিসির সমস্ত মন জুড়ে কোন ভাবনা কাজ করে?**

ক. নতুন সংসার রচনা
খ. পালিয়ে যাবার চিন্তা
গ. আহ্লাদিকে রক্ষা করা
ঘ. ব্যবসায়ে উন্নতি

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

পৃথিবীতে সাহসীরাই টিকে থাকে। কেননা সাহস মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। ভীরু কাপুরুষেরাই কেবল মরে। বার বার মরে।

**১১. উদ্দীপকের মূলভাব প্রকাশ পেয়েছে যে চরিত্রে–**

ক. পিসি-আহ্লাদি
খ. মাসিপিসি
গ. জগু-কৈলাশ
ঘ. কানাই-দারোগা বাবু

**১২. উদ্দীপক ও 'মাসিপিসি' গল্পে ফুটে উঠেছে–**

i. সাহসের বিকল্প নেই
ii. ভয় বিপদ বাড়ায়
iii. ভয় পুরুষতন্ত্রের সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে হাসু ও মায়মুনাকে নিয়ে অথৈ পাথারে ভেসে চলছিল জয়গুন। একসময় সমাজ ও লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। এভাবে জয়গুন অকূল পাথারে কূল খুঁজে পায়। কেননা তাকে নিজে বাঁচতে হবে। ছেলেমেয়েদেরকে বাঁচাতে হবে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এমনও হতে পারে তার এই জীবনসংগ্রাম অনেককাল ধরে চলবে।

ক. 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়' –উক্তিটি কার?

খ. মাসিপিসি কীভাবে কানাইকে প্রতিহত করেছিল?

গ. উদ্দীপকের জয়গুন 'মাসিপিসি' গল্পে কোন চরিত্রের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ঘ. উদ্দীপকে জীবন সংগ্রামের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা 'মাসিপিসি' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

"হে, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে।" করিম গাজী বলে, "আরে মিয়া এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফির‍্যা চলছো?" "কী করমু তয়?" বলে ওসমান। "কী করবা।" খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, "চল আমাগ লগে, দেখি কী করতে পারি।" করিম গাজী তাড়া দেয়, "কী মিয়া চাইয়া রইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু?" ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে, "তুই বাড়ী যা গা।" তার ঝিমিয়ে পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে– "হ, চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।"

ক. শকুনরা উড়ে এসে কোথায় বসেছে?

খ. আহ্লাদি কেন স্বামীর ঘরে যেতে চায় না?

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'মাসিপিসি' গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই অন্যায় প্রতিহত হয়।" –উদ্দীপক ও 'মাসিপিসি' গল্প অনুসরণে মন্তব্যটি বিচার করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়' –উক্তিটি পিসি করেছিল।

**খ.**

মাসিপিসি বঁটি ও কাটারি হাতে প্রতিবেশীদের ডেকে এনে কানাইকে প্রতিহত করেছিল।

কানাই বেশ রাত করে মাসিপিসিকে কাছারিতে ডেকে নিতে আসে। এতে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাছাড়া মাসিপিসি ঝোঁপের আড়ালে লুকানো সাধু বৈদ্য ও ওসমানকে দেখে ফেলে। তাই তারা ঘরে গিয়ে বঁটি আর কাটারি নিয়ে আসে। তারপর প্রতিবেশিদের জোরে জোরে ডাকতে থাকে। প্রতিবেশীরা ছুটে এলে অবস্থা বেগতিক দেখে কানাই তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। বস্তুত মাসিপিসির অদম্য সাহস আর আহ্লাদির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই কানাইকে প্রতিহত করতে মাসিপিসিকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

**গ.**

উদ্দীপকের জয়গুনের সঙ্গে 'মাসিপিসি' গল্পের মাসিপিসির সাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষকে নিজের অস্তিত্ব নিজেই টিকিয়ে রাখতে হয়। এটা করতে গিয়ে সে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তবুও মানুষ চলার পথে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংস্কার, বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যায়।

উদ্দীপকে জয়গুন নামের এক অসহায় নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে সে অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। অন্যদিকে 'মাসিপিসি' গল্পেও দেখা যায়, আহ্লাদির পিতা মারা যাওয়ায় মাসিপিসি অস্তিত্বের সংকটে উপনীত হয়। জয়গুন ও মাসিপিসির জীবনের সংকট তাদেরকে এক কাতারে এনে দাঁড় করায়। তারা পতিত হয় সমাজের পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তে। গল্পে মাসিপিসি যেমন আহ্লাদিকে আগলে রাখে তেমনি জয়গুনও তার দুই সন্তান হাসু ও মায়মুনাকে সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে। এভাবে উদ্দীপকের জয়গুনের সঙ্গে 'মাসিপিসি' গল্পে মাসিপিসির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ.**

উদ্দীপকে জয়গুনের জীবনসংগ্রামের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা 'মাসিপিসি' গল্পে মাসিপিসির জীবনসংগ্রামকে প্রতিফলিত করে।

মানুষকে জীবনে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। অন্যথায় সে বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যায়। জীবন কখনো অলসদের পক্ষ অবলম্বন করে না। সক্ষমতার শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করে মানুষকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হয়।

উদ্দীপকে জয়গুনের জীবনসংগ্রামের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাকে জীবনসংগ্রামে নামতে হয়। সে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জয়গুন জীবন যুদ্ধে নিজে বাঁচতে চায় এবং নিজের সন্তান হাসু ও মায়মুনাকে আগলে রাখে। এই যুদ্ধে সে জয়ী হয়। এভাবে একই চিত্র ফুটে উঠেছে 'মাসিপিসি' গল্পের মাসিপিসির জীবনচিত্রে। মাসিপিসি গ্রাম থেকে নানা রকম পণ্য সংগ্রহ করে শহরে বিক্রি করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি তারা তাদের সন্তানতুল্য আহ্লাদিকেও সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে।

উদ্দীপকে জয়গুন স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছে। আর নিজ সন্তান হাসু ও মায়মুনাকে সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে আগলে রেখেছে। ঠিক তেমনি দুর্ভিক্ষের কারণে মাসিপিসিও সমাজের সকল বিধিনিষেধ ও সংস্কার উপেক্ষা করে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ে। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের জয়গুনের জীবন সংগ্রাম 'মাসিপিসি' গল্পে মাসিপিসির জীবন সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চারমাস, সংসার আর চলে না, সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে ? সে তা জানে না। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে কিন্তু খাবে না।

ক. কোথায় ফলমূলের দাম চড়া?

খ. মাসিপিসি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে?

গ. মাসিপিসির কোন কোন বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের মমতা চরিত্রটিতে ফুটে উঠেছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকটি 'মাসিপিসি' গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে কি? –আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. ক ৭. খ ৮. ঘ ৯. খ ১০. গ ১১. খ ১২. ঘ

# সৌদামিনী মালো

## শওকত ওসমান

## লেখক-পরিচিতি

শওকত ওসমান ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবলসিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। তাঁর পিতা শেখ মোহাম্মদ এহিয়া ও মাতা গুলজান বেগম। শওকত ওসমান প্রথমে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে লেখাপড়া করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও বাংলা বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন পেশায় চাকরির পর ১৯৫৮ থেকে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছায় অবসরে যান। চাকরিজীবনের প্রথমদিকে তিনি কিছুদিন 'কৃষক' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। তিনি একাধারে গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, অনুবাদ ও শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। সবমিলে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৮০টিরও বেশি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক হিসেবে তাঁর সাহিত্যকর্ম সমাজ-সচেতনতামূলক ও প্রগতিশীল ভাবধারার শৈল্পিক ফসল। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) ও ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৯৮ সালের ১৪ মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

**শওকত ওসমানের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম :**

**উপন্যাস** : *বনি আদম* (১৯৪৩), *জননী* (১৯৫৮), *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *চৌরসন্ধি* (১৯৬৮), *জাহান্নাম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭১), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৩);

**ছোটগল্প** : *পিঁজরাপোল* (১৯৫০), *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫২), *প্রস্তর ফলক* (১৯৬৪), *জন্ম যদি তব বঙ্গে* (১৯৭৫), *মনিব ও তাহার কুকুর* (১৯৮৬);

**শিশুতোষ** : *ওটেন সাহেবের বাংলো* (১৯৪৪), *ক্ষুদে সোশালিস্ট* (১৯৭৩), *পঞ্চসঙ্গী* (১৯৮৭);

**প্রবন্ধগ্রন্থ** : *ভাব ভাষা ভাবনা* (১৯৭৪), *সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই* (১৯৮৫)।

## ভূমিকা

'সৌদামিনী মালো' গল্পটি শওকত ওসমান রচিত 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৪) থেকে চয়ন করা হয়েছে। গল্পটিতে বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজে জাতভেদ, ধর্মানুভূতির নামে মাতৃহৃদয়ের অবমাননার দিকটি ফুটে উঠেছে। অর্থ সম্পদের লালসায় ধর্মকে ব্যবহার করে মানবতার বিরুদ্ধে সমাজের মানুষের অবস্থানই এ গল্পের আলোচ্য বিষয়।

## সাধারণ উদ্দেশ্য

**শওকত ওসমানের 'সৌদামিনী মালো' গল্পটি পড়ার পর আপনি–**

- শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- 'সৌদামিনী মালো' গল্পের মাধ্যমে লেখকের অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা জানতে পারবেন।
- অর্থ, সম্পদ, লালসা কীভাবে মানুষকে অন্যায় ও দুষ্কর্মের পথে চালিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ধর্মান্ধতা কীভাবে মানুষকে মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করে তার বর্ণনা করতে পারবেন।

# পাঠ-১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- আমাদের সমাজে মানবাত্মা কীভাবে প্রতিনিয়ত অপমানিত হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।
- অর্থ, লোভ, লালসা মানুষকে কীভাবে অন্যায় করতে সহায়তা করে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

একটু দাঁড়াও।

আমার বন্ধু নাসির মোল্লা কোর্টের প্রাঙ্গণে হাঁটতে হাঁটতে হাতে হেঁচকা টান দিয়ে বললে।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার আছে। কোর্টের পেছনে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসা যাক।

আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা। খাজনাসংক্রান্ত একটা মামলা ছিল, তার পরের দিন। নচেৎ এখানে এই টন্নি-দালাল উকিল-মোক্তারের দঙ্গলে আর এক তিল দাঁড়াতে মন চায় না। কিন্তু আমার মামলায় তদবির, যুক্তি-পরামর্শ উকিলের দরদস্তুর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়ায় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হয়।

আমার আরও আপত্তি ছিল অন্য কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতটা বিলাত ঘুরে মক্কা আসার মতো। কোর্ট টিলার ওপর। পেছনে যেতে হলে এক ধাপ নিচে নেমে আবার ওপরে উঠতে উঠতে জান খারাপ। রীতিমতো হাঁপানি ধরে যায়।

তবু নাসিরের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমরা দুজনেই চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। এখনও সংসারের গেরো কাটেনি। আর সময় কাটাবে কী করে? কিছু না কিছু কাজে লেগে থাকতেই হয়। নাসির পাকাপোক্ত লোক। তার হাতে হাত সঁপেই আমি নিশ্চিন্ত। এই ক্ষেত্রে আর ঘাড় বাঁকিয়ে জোয়ালের ভার আরও বাড়াতে রাজি নই।

কিন্তু টিলাপথে যথারীতি নেমে আবার ওপরে ওঠার সময় তামাশা দেখা গেল। আদালতের পেছনে এক ফালি মাঠের ওপর বেশ ভিড় জমে গেছে একটা পাদ্রিকে ঘিরে। যিশুখ্রিষ্টের সেবকটিকে আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সামনে টাক-পড়া মাথা, ফরসা লম্বাটে চেহারা। গলায় ক্রস ঝুলছে।

এ তো আমার চেনা লোক! ব্রাদার জন। নাসির হঠাৎ বলে উঠল।

আমরা ক্রমশ ওপরে উঠছি। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে নাসির উচ্চারণ করে, আরে তুমি চিনবে না। এ হচ্ছে ব্রাদার জন। একবার কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেট করার অপরাধে আমার কোর্টে ব্যাটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরে সে কাহিনি বলব। এখন পা চালাও, দুজনে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বৃদ্ধকালে পাহাড়-চড়া অত সহজ নয়।

অকুস্থলে দেখা গেল, লোকজন কম জমেনি। ব্যাপার কী? ব্রাদার জন তখন চিৎকার করছে, এই সম্পত্তি খুব ভালো আছে। Very good ভেরি গুড।

আমরা দুই কৌতূহলী দর্শক। গিজগিজ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

পাদ্রি হাঁকছে, দর্শকমণ্ডলী। আমি তখন নাসিরকে বললাম, বেশ বাংলা বলে তো।

বহুদিন এই দেশে আছে, বলবে না কেন? নাসির জবাব দিয়েই আবার পাদ্রির ওপর চোখ ফেলল। পাদ্রি হাঁকতে লাগল, দর্শকমণ্ডলী! এই সম্পত্তি খুব ভালো সম্পত্তি আছে। এক প্লটে বারো 'কানি' জমি। পুকুর। আরও আছে তিন একর জমির ওপর বসতবাড়ি, পুকুর, গাছপালা, দশটা নারিকেল গাছ, লিচুগাছ পাঁচটা আরও ফ্রুট-ফলের গাছ আছে। এখন নিলাম ডাকা হবে। প্রস্তুত–। ব্রাদার জন দম নিল।

কৌতূহলী শ্রোতা দর্শক এবার উৎকর্ণ। একজন নেপথ্যে জানতে চাইল, সম্পত্তি কার?

এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সৌদামিনী মালো সিস্টার।

আজব নাম!

পাদ্রি ব্যঙ্গ স্বর শুনে আরও বিনয় সহকারে ঈষৎ জোর-গলায় বলে উঠল, সৌদামিনী মালো চার্চের সিস্টার– বহেন, ভগ্নী ছিল। তিনি এক মাস হয় মারা গেছেন। চার্চ তার সম্পত্তি নিলাম করছে। শ্রোতাদের মধ্যে এবার একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, কারণ আকাশের রোদ্দুর বেশ নির্দয়। হঠাৎ গরম পড়ছে। নেপথ্যে একজন বললে, সাহেব জলদি করো।

অলরাইট উচ্চারণের পর ব্রাদার জন হেঁকে উঠল, সৌদামিনী মালো, সৌদামিনী মালো, তারই সম্পত্তি এবার নিলাম শুরু হবে। আমাদের পয়লা ডাক পাঁচ হাজার। তারপর আপনারা বিডিং করুন। 'হায়েস্ট বিডার' উচ্চতম মূল্যে যিনি ডাকবেন, তিনিই পাবেন।

পাদ্রির সঙ্গে দুজন কুলি শ্রেণির যুবক ছিল। তাদের দিকে চোখ ইশারামতো একজন হেঁকে উঠল, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার।

তার ডাকের মধ্যে জনান্তিকে একজন ডাক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ। পাদ্রির সহকারী হাঁকলে পাঁচ হাজার পাঁচশ। আর কেউ ডাকবেন। কিন্তু আর কারো হাঁকডাক শোনা যায় না। অবিশ্যি দর্শক-মধ্যে গুজগুজুনি চলছে নানা কথা। পাদ্রি-সহকারী আবার হাঁক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ– এক– পাঁচ হাজার পাঁচশ– দুই–। হঠাৎ একজন ডাক বাড়ালে, ছ-হাজার।

ভেরি গুড, ব্রাদার জন বলে উঠল। তার সহকারী ছ-হাজার ছ-হাজার রবে আরও কয়েকবার হাঁক দিলে। শেষে আর একজন ডাকিয়ে বাড়াল। সে সাত হাজার দাম তুলে দিলে।

আমরা বেশ মজা দেখছিলাম। কিন্তু বাড়তি টাকা তো নেই। পেনশনে যে কটা টাকা পাই তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। নচেৎ এত বড় সম্পত্তি পাওয়া যেত। বড় আফসোস হতে লাগল। দাঁড়িয়ে ছিলাম, সম্পত্তি কোন ভাগ্যবানের পাতে যায় তা দেখার জন্যে।

নিলাম জমে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু ন-হাজারের পর আর দাম শতে শতে লাফ দিয়ে যায় না। একজন ডাকলে ন-হাজার ন-শ পঞ্চাশ। আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়ল। দশ হাজার।

পাদ্রি-সহকারী হাঁক দিতে লাগল দশ হাজার এক– দশ হাজার দুই–। তারপর সে স্তব্ধ। জনতা নীরব। তিন বলার আগে একজন মাত্র পঁচিশ টাকা যোগ দিলে। দশ হাজার পঁচিশ।

ওদিকে রোদ্দুর বাড়ছে। বৃদ্ধকালে তবু কেন দাঁড়িয়েছিলাম? আজ বলতে লজ্জা নেই। হয়ত সম্পত্তির লোভে। ক্ষুধার্ত কালেভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত আরও পঁচাত্তর টাকা দাম বাড়ল। অর্থাৎ দশ হাজার একশ। বোঝা গেল, নিলাম ডাকিয়েদের পকেট শুকিয়ে যাচ্ছে। রস নাদারাৎ। যিনি শেষ পঁচিশ টাকা বাড়িয়েছিলেন, ভিড়ে তাঁকে দেখা গেল না। তবে হাত নাড়ছিল সে অপরের কাঁধের ওপর দিয়ে।

পাদ্রি-সহকারী হাঁক দিলে, দশ হাজার একশ– এক, –দশ হাজার একশ– দুই–। সে থামলে তারপর। পাঁচ ছ-মিনিট কেটে গেল। আর তিন উচ্চারণ করে না সে। এবার লোকটাকে দেখলাম, যে দশ হাজারের ওপর একশ বাড়িয়েছিল। মাঝবয়সী লোক, কিন্তু বুড়োবুড়ো ঠেকে। প্যান্ট-কোট-টাই সমন্বিত। মাথায় মখমলের টুপি। বাজি মেরে দিয়েছে, এই ভাব চোখেমুখে। কতক্ষণ আর নিলাম-ঘর চুপ থাকতে পারে? কিন্তু 'তিন' আর উচ্চারিত হয় না। দর্শক অধৈর্য। সেও জবাব চেয়ে বসল।

এখন বেশ মজা বেধে গেছে। কৌতূহলী দর্শক তাই দাঁড়িয়ে থাকে। রোদ্দুর সত্ত্বেও নড়ে না। ব্রাদার জনের মুখের দিকে তাকাই। সেখানে কালো আর ফিকে সবুজ রং খেলা করছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু একটা কাশি দিয়ে হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে উঠে সে হাঁক মারলে, দর্শকমণ্ডলী।

কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। নিলামদাতা এবার কী করবে।

ব্রাদার জন মুখ খুললে, যেন গির্জার পুলপিট অর্থাৎ প্রচারবেদি থেকে সার্মান দিচ্ছে এমনই কণ্ঠস্বর : ভ্রাতৃগণ, আজ নিলাম এখানেই রহিত থাকবে। আগামীকল্য পুনরায় ডাকা হবে। আজ লোক খুবই কম। কাল দশ হাজার এক শ হইতেই আরম্ভ হইবেক। আমেন।

দর্শকদের মধ্যে অনেক গুলতানি শুরু হলো। আর টুপিপরা সেই শেষ পোঁচ-মারা নিলাম-শিল্পী তো রেগেই খুন। ব্রাদার জনের চারদিকে জটলা পেকে গেছে। সেখানে ভদ্রলোক জোর গলায় বলছে, This is sheer hypocrisy এটা জোচ্চুরি... ইত্যাদি। আমার কৌতূহলের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ভিড়ের সান্নিধ্য এই ক্ষেত্রে আরামদায়ক। আমি তাই পা বাড়াই। নাসির আমার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললে, আরে ভিড়ে সেঁধিও না।

একটু মজা দেখে যাই।

–মজা দেখে আর কাজ নেই। যা গরম সর্দিগর্মি হয়ে মরব, চলো বাড়ি যাই।

–একটু দেখে যাই না।

–দেখে কাজ নেই। আমার কাছ থেকেই সব বৃত্তান্ত শুনে নিও। আকাশে সূর্য তখন দোজখের পিণ্ড বললেই চলে। আমি নাসিরের কথা মেনে নিলুম।

আবার চড়াই-উৎরাই। ওঠানামার ব্যাপারটা এমন কষ্টকর। নাসির হেসে বললেন, আরও মজা দেখতে গেলে আমাদের মাজা ভেঙে যেত।

রসিকতার দিকে আমার খেয়াল ছিল না। আমি বললাম, নাসির, ব্যাপার কী?

সে বেশ মাথা দুলিয়ে হঠাৎ ব্যঙ্গ আর ক্রুরতা-মাখানো এক রকমের হাসি ছাড়িয়ে শেষে মুখ খুলল, বাবা, এর নাম ব্রাদার জন।

জন?

হাঁ, ও এক জন বটে। আমার কোর্টে কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, What have you to say তোমার কী বলার? জন জবাব দিল End justifies the means, উদ্দেশ্য দিয়েই উপায়ের বিচার করা উচিত। আমি ব্ল্যাকমার্কেট করিয়াছি ভিক্ষুকদের লঙ্গরখানায় ভাত প্রদানের জন্য।

–অপরাধ স্বীকার করলে?

–হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাটা পাকা বদমাশ। আজ দেখলে না, কীভাবে ম্যানেজ করলে।

–কী ম্যানেজ?

–ওই সম্পত্তির দাম কমসে কম পঁচিশ হাজার। দশ হাজারে ছাড়তেই পারে না।

নাসির আমার দিকে মুখ কুঁচকে চোখ নাচিয়ে, জনের বাহাদুরির অবস্থাটা ফোটাতে চাইলে।

–কিন্তু সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি, আর নিলাম করছে ব্রাদার জন? এ ব্যাপারটা কী?

নাসির তার সাদাচুল মাথা দুলিয়ে চোখের কোনায় হাসি মাখিয়ে জবাব দিলে, সেটাই তো মজা।

–মজা?

–শোনো। সে অনেক কথা। ব্রাদার জনের মতো চিজকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক বয়ান প্রয়োজন।

–তো বয়ান করো।

বেলার দিকে খেয়াল আছে? খেয়েদেয়ে এসো সন্ধ্যায় আমার বাড়ি, তখন সব সবিস্তার বলব ব্রাদার জন-সৌদামিনী মালো উপাখ্যান।

–না, অত দেরি করতে পারব না। খেয়ে একটু জিরিয়েই বিকেলে আসছি। বিকেলের চা তোমার ওখানেই খাব।

–বেশ।

কথায় কথায় আমরা রাস্তায় এসে পড়েছি। উৎরাই শেষ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাতে লাগলুম।

জানো সাজ্জাদ, ভাবছি কোথা থেকে আরম্ভ করব। ব্যাপারটা বেশ জটিল। নাসির মোল্লা এখন বুড়ো হয়ে এসেছে বলতে পারো। তাই ভয় পাচ্ছে। তবে শুরু করতে হয়।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অকুস্থল–** ঘটনাস্থল। **উৎকর্ণ–** কান খাড়া করে আছে এমন। **গেরো–** বন্ধন, বাঁধন। **গুজগুজুনি–** গুঞ্জন। **জনান্তিকে–** আড়ালে থেকে, একপাশে থেকে বা নেপথ্যে। **জান খারাপ–** অবস্থা ভালো নয়। **টন্নি–** টর্নি, আমমোক্তার। **নাদারাত–** বিহীন, শূন্য, অভাব, নাই। **বয়ান–** বিবরণ, বর্ণনা। **বিডিং–** নিলামে দাম হাঁকা। **মোগলের সাথে খানা খেতে হয়–** বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করতে হয়, পরিস্থিতির চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি দিতে হয়। 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে'–প্রবাদটির অনুসরণে রচিত বাক্যবন্ধ। **লঙ্গরখানা–** বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের স্থান। **সার্মান–** গির্জার বেদি থেকে প্রদত্ত ধর্মীয় বা নৈতিক অভিভাষণ। **হায়েস্ট বিডার–** সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকিয়ে, জনগণের আড়ালে। hypocrisy– কথায় এক কাজে আরেক, ভণ্ডামি। sheer– পুরোদস্তুর, নির্ভেজাল।

## সারসংক্ষেপ

গল্পকার গল্পের এ-অংশে অর্থ-সম্পদের মোহ মানুষকে কীভাবে মানবিক গুণ থেকে দূরে সরিয়ে অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করে তা দেখিয়েছেন। গল্পের প্রথমে ব্রাদার জনের মাধ্যমে বৃটিশদের মানসিকতা, এদেশে তাদের দু-একটা ভালো কাজে হাত দেবার উদ্দেশ্য, সর্বোপরি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। গল্পের শুরুতে সৌদামিনী মালো নামের এক নিঃসন্তান ধর্মান্তরিত নারীর বিরাট বসতবাড়িসহ পুকুর-গাছপালার নিলাম ডাকা হচ্ছে। সম্পত্তি সৌদামিনী মালোর, আর তার নিলাম ডাকছে খ্রিষ্টান পাদ্রি ব্রাদার জন। নিলাম ডাকার নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ দরদাতা সম্পত্তির অধিকারী হলেও ব্রাদার জন কাঙ্ক্ষিত মূল্য না পাওয়ায় নিয়ম ভঙ্গ করে নিলাম স্থগিত করে এবং পরবর্তী দিন থেকে আবার সেখান থেকেই ডাক শুরু করার ঘোষণা দেয়। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে গুঞ্জনসহ ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সৌদামিনী মালো কীভাবে সৌদামিনী সিস্টার হলো এবং কীভাবেই বা এত সম্পত্তির মালিক হলো এবং তা কেন নিলাম হচ্ছে গল্পকার পাঠের এই অংশে তা বলেননি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. বৃদ্ধকালে কোনটি চড়া সহজ নয়?**

ক. পাহাড়　　খ. টিলা
গ. গির্জা　　ঘ. কোর্ট

**২. 'অগত্যা মোগলের সাথে খানা খেতে হয়' উক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–**

ক. মোগল সম্রাটদের সঙ্গে খেতে হবে　　খ. বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করতে হয়
গ. পাদ্রিদের সঙ্গে খাবার খেতে হবে　　ঘ. ইচ্ছে করে নতি স্বীকার করতে হয়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরও শমসেরের সঙ্গ ছাড়তে পারিনি। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। বিকালে ঘুরতে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন তার অপেক্ষায় থাকি।

**৩. উদ্দীপকের শমসের 'সৌদামিনী মালো' গল্পের কোন চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়?**

ক. নাসির　　খ. ব্রাদার জন
গ. মনোরঞ্জন　　ঘ. জগদীশ

**৪. উদ্দীপক ও 'সৌদামিনী মালো' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে?**

i. আবেগের আতিশয্য
ii. ধূর্ততা
iii. ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

# পাঠ-২

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- মানুষ কীভাবে হীন উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে, তা লিখতে পারবেন।
- সৌদামিনী কোন প্রেক্ষাপটে স্বধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধিবাসিনী। নবীগঞ্জে যে ব্যাপটিস্ট মিশন আছে, তারই কাছাকাছি। তুমি ওই অঞ্চলে কত দিন সার্কেল অফিসার ছিলে, জায়গাটা তো চেনই। অবিশ্যি তখন ওখানে মিশনের পাদ্রি ছিল ফাদার জনসন। লোকটা ভালোই। এদের আবার ভালোমন্দ কী? ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত পাকা করতে এদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, যেন দরকার মতো আউটপোস্টের কাজ করতে পারে। গরিব দেশে এখানে ওখানে দু-চারটে দাতব্য ডিসডেন্সারি কী এক-আধটা স্কুল চালায়। লোকেরা ভাবে, আহা কী সব দয়ার প্রাণ; ব্রিটিশরা ভালোই জানত, The nearest way to poor man's heart is down their throat– ইংরেজেরই প্রবাদ। ওরা এইভাবে কিছু কিছু খ্রিষ্টানও বানায়। তারা তো ইংরেজের খয়ের খাঁ বনে যেত। বলতে পারো– ইংরেজ করে ফেলে। পড়োনি নজরুলের 'মৃত্যু-ক্ষুধা'? আসলে এরা কেউ যিশুখ্রিষ্টের ভৃত্য নয়, এরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভৃত্য। হ্যাঁ, কোথা থেকে কোথা এসে পড়লাম। একটু ধৈর্য ধরে শোনো। বৃদ্ধকালে তাল রাখা দায়। কথায় কথায় অনেক দূর চলে গেছি।

হ্যাঁ, সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো ছিল পেশায় আরদালি। কিন্তু বেজায় তুখোড় লোক। প্রভুর মন জুগিয়ে চলা শিল্প সে বেশ রপ্ত করেছিল। যে কোনো অফিসারকেই খুশি করার পন্থা আবিষ্কারে দক্ষ জগদীশ মালো। ফলে, কলা-মুলো ভালোই পেত। বখ্‌শিসে মোটা পেট, এমন আরদালি তুমি দুটি খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি অবশ্যি তাকে দেখিনি। আমারও শোনা কথা। সস্তার বাজার। পুরা বেতন বাঁচল, তার ওপর উপরি ইনকাম। আর সে তো মিশরের সম্রাট হতে চায়নি। চেয়েছিল, গ্রামে দু-চার বিঘে জমি-জিরেত, একটু অনটন-মুক্ত দিন-যাপন। পনের-বিশ বছরের চাকরিতে জগদীশ তা পুষিয়ে নিলে। কিন্তু বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলেপুলে নেই। সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে, আর একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত; অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক। বংশ তো গুম করে দেওয়া চলে না? কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায়নি। হঠাৎ মরে গেল। অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে। কু-লোকেরা রটিয়ে দিলে সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়েছে। বংশ রক্ষা হোক, কিন্তু অপরের সন্তানে নয়। সৌদামিনী ভিতরে ভিতরে হয়ত এমন একটা দুর্জয় পণ করে বসেছিল। এসব খোদাকেই মালুম। এসব ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে কী করে, বোঝা দায়। কিন্তু তুমি বলছ, স্বামীকে হত্যা করবে– তা অনুমান করা মুশকিল। মুশকিল কিছুই নয়। এমন হতে তো পারে। আমিও বলছি, গুজবের কথা। কারণ, এসব নিয়ে আর কোনো তদারক হয়নি। তখন সৌদামিনীর বয়স চল্লিশ পার। জগদীশ পঞ্চাশের সামান্য এদিক কি ওদিক। হয়ত যৌবনের খাঁই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে– তা সৌদামিনী মনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি। এতএব 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল' আচ্ছা। আমিও বলছি, অনুমানের কথা। যাক, ও-পাট চুকল। সৌদামিনী তখন একা। কিন্তু সেও হুঁশিয়ার মেয়ে। আর রবদব ছিল জোর। তখনও দেহ আছে, তার ওপর সম্পত্তি। গ্রামের দু-চার জন ছুঁচোর মতো হয়ত হোঁ হোঁ শব্দে ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু সৌদামিনী গোপনেও জগদীশেরই বউ হয়ে থাকল। অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। অবিশ্যি জগদীশ একটা কাজ করে যেতে পারত। কোনো আত্মীয়ের নামে সম্পত্তি লিখে পড়ে সৌদামিনীকে জীবনস্বত্বের অধিকারিণী করে দিতে পারত।

কিন্তু তা হওয়ার জো ছিল না। এক নিকট আত্মীয় ছিল জেঠতুতো দাদা। সে স্বদেশি করত। জগদীশ সরকারের পেয়ারের লোক। অন্য দিকে স্বদেশি বাবু। সাপে-নেউলে আর কী দিয়ে বন্ধুত্ব হবে। এসব কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে সব বুঝতে পারবে। জগদীশ তো মরল। কিন্তু জের কাটল না। বিধবার সম্পত্তির দিকে ওই আত্মীয়ের লোভ সহজে কি মেটে! অবশিষ্ট আট দশ বছর এইভাবে কেটে গেছে। স্বদেশি বাবুর নাম মনোরঞ্জন মালো। তারও বয়স হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেপুলে আছে। জেল-টেল খেটে গ্রামে ফিরে সে নামে স্বদেশি বাবু রইল। সাদা টুপিটা পকেটে গুঁজে অথবা দরকার হলে মাথায় দিয়ে সেও মন দিলে সংসার গোছাতে। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলান এবং তৎ-মত্ততার দুচার পয়সার দালালি বা টন্নিগিরি কমিশনে একটা আয়ের পথ তো খোলা যায়। এককথায়, স্বদেশি বাবুর শুভ্রতা তার টুপির মধ্যেই নিবদ্ধ রইল। পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং বিধবা বৌদির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। ভুল বললাম, বৌদি নয়, সম্পত্তির দিকে। কিন্তু সৌদামিনীর শরীর গৌর আর মুখ সুন্দর হলেও, কঠোর হওয়ার মতো যথেষ্ট তেজ ছিল। অবরে-সবরে এই মানুষ আবার হীরার চেয়ে শক্ত হতে পারে। যত বাগ্‌ড়া তো সেইখানে। নচেৎ মনোরঞ্জন মালো কবে দুর্গ ফতে করে ফেলত। মনোরঞ্জন মালো প্রথম প্রথম কতগুলো স্ট্র্যাটেজি– পাঁয়তারা কষে নিলে। একদিন হয়ত সকালে দেখা গেল, সৌদামিনির কলাবাগান থেকে কয়েক কাঁদি পাকা ফল গায়েব। কিছু চারাগাছ মাড়ানো। কিন্তু পাড়াপড়শিদের খুব মিষ্ট ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে এল। আর কিছু না। তারপর মাঝে মাঝে রাত্রে সে বন্দুক ছুড়ত। কমিশনার সাহেব জগদীশকে নিজের বন্দুক দিয়েছিলেন বখশিসরূপে। অস্ত্রখানা তখনও সৌদামিনীর কাছে আছে। তাছাড়া তার তাক আশ্চর্য। বাড়ির উঠানে চিল ঢুকতে সাহস পায় না। মনোরঞ্জন ফেল মারলে। বৌদির চেহারা সুন্দর, কিন্তু তেজ তেমনি অপর্যাপ্ত। অবিশ্যি সৌদামিনীর হাতে কয়েকটা লোক ছিল। তার জমিনের চাষি, কয়েকজন। তারা বলত, মায়ের অন্নে প্রতিপালিত, মার তো অপমান হতে দিতে পারি নে। স্বদেশি বাবুর সেও একটা ভয়। ছোটো লোকগুলো কখন কী করে বসে, বলা যায় না। আর সৌদামিনীর অন্তর ছিল। বিপদে-আপদে সে বহু মানুষকেই সাহায্য করত। বেড়ার মধ্যে গেরস্থর মুরগি দেখলে জিভে জল-সরা শেয়াল যেমন ঘন ঘন তাকায় আর লোভের চোটে ছটফট করে, মনোরঞ্জন মালো সেই রকম অবস্থায় নতুন পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়। অবিশ্যি সময়ও এদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা মনে রেখো। বছর যাচ্ছে বছর আসছে। সৌদামিনীর চুল ক্রমশ সাদা, দেহে প্রৌঢ়ত্বের রেখা। কিন্তু আদাওতি ঠিক চলছে। সৌদামিনী বনাম স্বদেশি বাবু।

ঠিক এই পর্যায়ে দেখা দিল ব্রাদার জন। সে তো পরকালের চেয়ে ইহকালের খবর ঢের বেশি রাখে। তারপর মিশনের অবস্থা ভালো নয়। ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছিল। ফলে ডোনাররা আর খাত-মতো চাঁদা পাঠায় না বা হার দিয়েছে কমিয়ে। সুতরাং আয়বৃদ্ধির উপায় একটা করতেই হয়। ব্রাদার জন এলাকার খবর জানত। মনোরঞ্জনের সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কারণ, বাবু এলাকার সবচেয়ে ভালো ইংরেজি কইয়ে-বলিয়ে। ভাষা মারফত একটা অদৃশ্য যোগসূত্র গড়ে ওঠে। অবিশ্যি তখন পাদ্রির ভূমিকা তত প্রকট হয়নি। আর বাবুর সঙ্গে কী কথাবার্তা হতো তা খোদকেই মালুম।

কিন্তু সৌদামিনী সকলের মুখে ছাই দিয়ে বসল।

ব্যাপারটা বলছি। সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আট-দশ-বিশ-মাইল দূরে দূরে তার মাতৃকুলের কিছু ভাইবোন কুটুম আছে। এক জায়গায় থেকে থেকে মানুষের প্রাণ তো হাঁপিয়ে ওঠে। সৌদামিনী বছরে এমন দু-একবার দম ফেলতে বেরুত। তখন ঘর পাহারা দিত তার চাষি এবং কামিনেরা। সৌদামিনী এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, ওরা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে আর কোনো আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এবার সে শুধু বেড়িয়ে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা বছর দুয়েকের শিশু। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আনা। পোষ্যপুত্র রাখবে সৌদামিনী। পোষ্যপুত্র? সম্পত্তির দিকে যারা চোখ রাখছিল, তারা এবার আকাশের দিকে চোখ তুললে। সম্পত্তির নতুন শরিক জুটে গেছে। আর শুধু মালিক নয়, চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারী। যেন সদ্য আঁতুড়ঘর-ছাড়া। চব্বিশ প্রহর চোখে চোখে রাখতে লাগল ছেলেটাকে। নাম রাখলে হরিদাস। হরিদাস বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারাটা ফরসা, বেশ খাড়া নাক। আর চোখ দুটো ঝিলিকে ঠাসা। সৌদামিনী হরিদাসের মধ্যে জীবনের সমস্ত পূর্ণতার একটা প্রতীক খুঁজে পেলে যেন। বেশি বাইরে যেতে দিত না তাকে। কারণ, পাড়াপড়শির চক্ষুশূল। ওর জন্যে আলাদা একটা শিক্ষকই রেখে দিলো বাড়ি এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। আরও পাঁচ-ছ বছর এভাবেই কেটে গেল। সৌদামিনীর অবিশ্যি চুল পেকে গেছে। চেহারা নিষ্প্রভ। কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। সেই মুখের দিকে তাকালে তোমার চোখ খুঁজে পাবে স্নিগ্ধতা, দয়াসঞ্জাত এক রকমের তাপহর স্পর্শ। অবিশ্যি মনোরঞ্জন বসে নেই। তারও বয়স বাড়ছে। আর তৎসঙ্গে সংসার। অর্থাৎ সর্ব রকমের বোঝা। সম্পত্তির দিকে চাইলে এখন চোখ পুড়ে যায়। নতুন শরিক এসে জুটেছে। হরিদাসের বয়স বারো। একটা মেয়ে মানুষের কাছে হেরে যাবে মনোরঞ্জন মালো? একটা কিছু করতে হয়। ব্রাদার জনের মিশন চলছে না ঠিকমতো। রুজি-রোজগার প্রয়োজন। একদিন ওদিকে গেলে কিছু একটা যুক্তি করা যায়। মনোরঞ্জন মনে মনে এসব লঙ্কাভাগ করেছিল নিশ্চয়। আঁচ করতে পারো সাজ্জাদ। ... হ্যাঁ, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু। মনোরঞ্জন মালো এবার একটা বোম ফাটালে, স্বদেশি আমলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে থেকেও যা সে করতে সাহস পায়নি।

সে গ্রামময় প্রচার করে দিলে সৌদামিনীর পোষ্যপুত্র জাতে নমশূদ্র নয়, ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ। কী ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপকর্ম। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে এক শূদ্রাণী। রাম, রাম। মনোরঞ্জন এই ঢিলে পাখিকে কাত করে ছাড়লে। আগে শত্রুতা বা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গ্রামে দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ-কায়েত-মাহিষ্য ছিল, তারা দাঁতে আঙুল কাটলে। ছি ছি, এমন কথা কে কোনদিন শুনেছে। যাদের বয়স বেশি তারা মন্তব্য করল : কলি কাল। সৌদামিনীকে গ্রাম্য-সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। সে বেশ জোর দিয়ে হলপ্ করে বললে, হরিদাস শূদ্র– তার দূরসম্পর্কীয় এক গরিব আত্মীয়ের ছেলে। পরিস্থিতি আপাতত এখানে চুকল। কিন্তু সৌদামিনীর বিরুদ্ধে তো মনোরঞ্জন একা নয়। আরও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আছে। সুতরাং গ্রামের অচল নিষ্কর্মা প্রহর তারা সহজে যেতে দিলে না। খোঁজ নিয়েই দেখা যাক। যদিও বিশ মাইল দূরে, কিছু রাহা খরচ যাবে, যাক। আহা, ভগবান যাকে ডাক দেয় সে তো হেঁটে হেঁটে বারানসি চলে যায় তীর্থ করতে। এই দশ ক্রোশ পথ আর তারা সামাল দিতে পারবে না? বোঝা গেল ওদের সেবার ভগবান ডাক দিয়েছিল। একজন দেব-উৎসর্গিত প্রাণ বারোয়ারি রাহা-খরচে সৌদামিনীর সেই আত্মীয় বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে ফিরল। বাজিমাতা মজকুর ব্যক্তির কোনো ছেলেই নেই। সব মেয়ে। সৌদামিনী ঝুট বলেছে, মিথ্যাবাদিনী। সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে চায়। তো নচেৎ কল তো ভেঙে যেতে পারে। সৌদামিনী এবার তো বেশ রোয়াবের সঙ্গে জবাব দিলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করলে না। সমস্ত গ্রাম তার বিরুদ্ধে। আর জুলুম শুরু হলো। তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না, দুধেল দুটো গাই হারিয়ে গেল। এমন ছোটোখাটো নিত্য নির্যাতন। একদিন ব্রাদার জন এই সময় গ্রামে এল। ইহকালের খবর সে পরকালের চেয়ে কম রাখে না, আগেই বলেছি। ব্রাদার জন সব শুনে গ্রামবাসীদের মিটিয়ে ফেলতে বলল ব্যাপারটা, সৌদামিনীর সামনেই। একটা ছেলে মানুষ করছে ... মানুষ ... সে শূদ্র আছে না কায়েস্ত আছে গড এসব দেখিতে বারণ করিয়াছে ... এই জাতীয় নানা বাণী ছাড়লে। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে ব্রাদার জনকে উকিল পাকড়ালে একটা মিটমাটের জন্যে। মনোরঞ্জন মালোর সঙ্গেও একপাশে চুপি চুপি কী কথা হলো তা ব্রাদার জনের গডই জানে। বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কিন্তু মনোরঞ্জন মালো তো সম্পত্তি নিষ্পত্তি চায়। ব্রাদার জন বললে, দুদিন সবুর করো, আমি ফয়সালা করিয়ে দিবে। আর মনে রেখ, সৌদামিনী এখন কোণঠাসা। এক হপ্তায় তার চুল শন হয়ে গেছে। আগে তো বুড়ি মনে হতো না, এখন তো শ্মশানযাত্রীর শামিল ধরে নিতে পার। বুড়ি সেই অবস্থায় ওকে যারা দেখেছিল, তাদের কাছেই শুনেছি। হরিদাস আর বাড়ির বাইরে যেত না। যেতে চাইলে সৌদামিনী কেঁদেকেটে বাধা দিত। চতুর্দিকে ঘোলাটে আবহাওয়া। ব্রাদার জন এই গ্রামে আসে কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করে না। শেষে কয়েকজন মরিয়া-ধর্মপুত্র তো একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল। কিন্তু শান্ত প্রকৃতির বুড়ো মানুষ এই ঈশ্বর-প্রাণ ব্যক্তিদের থামাল। সৌদামিনী বাপের বেটি। বাঘের দুধ খেয়েই বোধ হয় মানুষ– বেরিয়ে এল একদম নিরস্ত্র, যদিও বাড়িতে বন্দুক আছে। ক্ষিপ্ত জান্তার সামনে সে এবার বোমা ফাটাল। বোমাও বোধ হয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনী চোখ থেকে শিবের মতো আগুন ছড়িয়ে বললে... কী বললে শোন। তার কথাটাই মুখজবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর ওপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।

–শোন অভাগির ব্যাটারা, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের দল ... আমার হরিদাস শূদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন, কী। তোরা তো জানিস। আমি বছরে একবার-দুবার আত্মীয়বাড়ি যাই। তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, একদম পুরো কোটাল। গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার দু-হাজার লোক মরছে হপ্তায়। আমি ফিরছিলাম হরিশ্চক থেকে ... আলোকডাঙার কাছাকাছি আসতে বেহারাদের তেষ্টা লাগল। একটা আমগাছের তলায় পালকি রেখে ওরা গেল খেতে। পুকুর আছে, বিঘে দুই জমি দূরে। আমার সামনে আবার একটা ধানক্ষেত, ধান পেকে গেছে। আর পনের দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজের ক্ষেতের চাল খেয়ে; কিন্তু তার আর হলো কই। হঠাৎ শুনলাম, ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে। মুখে দাড়ি। তার পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে বসে মরা মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে; আবার উঠে বসছে। কিন্তু সেও চিঁচিঁ করছে। ধুঁকছে। ছেলেটার পানে চাইতে আমার দিকে হাত বাড়াল। চোখের চাউনি কী করুণ। আমিও অজানিতে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বছর তিনেকের ছেলে, কিন্তু অনাহারে অনাহারে দেড় বছরের বেশি দেখায় না। কোলে তুলে নিলাম... নিয়ে এলাম... পালকির ভেতরে লুকিয়ে রাখলাম... আফিম খাই, সঙ্গে দুধ ছিল... দুধ দিতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। বেহারারা টের পেলে না। এক আত্মীয়ের কাছে তিন মাসের জন্যে রেখে এলাম দুশ টাকা দিয়ে। ভালো খাওয়া দাওয়ায় ছেলেটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। তার পর নিয়ে এলাম। ওর আসল বাবা সেই মুসলমান চাষি ... আমার হরিদাস মুসলমান ... যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার ওপর।

রেশ কাটল কয়েক মুহূর্ত পর। কিন্তু সৌদামিনীকে কেউ একটা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেল না। তামাশা দেখতে দু-চার জন মুসলমান পর্যন্ত জুটেছিল। এখন ব্যাপার আরও গন্ডগোলে গড়াতে পারে, তাই ধর্মপুত্ররা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে। বুঝল আর গোলমাল বিধেয় নয়। ব্যাপার আরও থিতিয়ে দেখা যাবে।

মনোরঞ্জন অন্তত তাই-ই ভেবেছিল। তাই ভেগেছিল।

সেই রাত্রে হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডাকিয়ে আনলে এক হপ্তা অপেক্ষার পর। সে খ্রিষ্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে, উপদেশ দিলে, ধর্ম ত্যাগ ভালো নয়। শোনা কথা বলছি। ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে 'আজ থাকলে হতো' বলার মতো।

সৌদামিনী খ্রিষ্টান হয়ে গেল। তিন চার দিনের মধ্যে তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখেপড়ে দিলে পর্যন্ত। নিজে উঠে গেল মিশনের বাড়িতে। ব্রাদার জন সম্পত্তি দেখার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ করলে। সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। বদলি হওয়ার আগে এক সিস্টারের মুখে শুনেছিলাম, সৌদামিনী কাঁদত আর চিৎকার দিত :

...আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে– হে যিশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার যবন হরিদাসকে ফিরিয়ে দে– ফিরিয়ে দে– ফিরিয়ে দে–

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অবরে-সবরে–** সময়ে-অসময়ে। **আদাওতি–** শত্রুতা, বিদ্বেষ। **কামিন–** স্ত্রী-মজুর, মজুরনি। **কায়েত–** কায়স্থ। **কোটাল–** অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সমুদ্র বা নদীতে জলস্ফীতি, ভরা জোয়ার। এখানে সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত। **খাঁই–** কামনা-বাসনা। **ডোনার–** দাতা। **তাপহর–** উত্তাপ দূর করে এমন। **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির–** মহাভারতের চরিত্র, অত্যন্ত সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। পঞ্চপাণ্ডবের প্রথম পাণ্ডব। ধর্মদেবতার ঔরসে কুন্তির গর্ভজাত সন্তান। এই গল্পে ব্যঙ্গার্থে সত্যবাদিতার ভানকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদী বা রটনাকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। **ফতে–** জয়। **বারোয়ারি রাহা খরচে–** সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে সংগৃহীত পথ খরচে। **ব্যাপটিস্ট মিশন–** খ্রিষ্টধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচার ও দীক্ষা কেন্দ্র। **মুখজবানি–** মুখের ভাষায়। **মজকুর–** পূর্ববর্ণিত। **মালুম–** অনুভূত, বোধগম্য। **মাহিষ্য–** কৈবর্ত জাতি। **রোয়াব–** সম্ভ্রম। **জান্তা–** জোর করে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক চক্র, এখানে আক্রমণকারী। **সার্কেল অফিসার–** এক ধরনের সরকারি কর্মকর্তা, কার্যক্রম পরিমণ্ডলের কর্মকর্তা। **রবদব–** জাঁকজমক। **স্ট্র্যাটেজি–** লক্ষ্য ও সাফল্য অর্জনের কৌশল বা নীতি।

## সারসংক্ষেপ

সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো পেশায় আরদালি ছিল। সে অফিসারকে খুশি করে পনের-বিশ বছরের চাকরিতে ভালো অবস্থা করেছে। সৌদামিনীর ছেলেপুলে না থাকায় জগদীশ মালো আর একটা বিয়ে করার চিন্তা করে। কিন্তু জগদীশ বর সাজার আগে কেন মারা গেল তা অজানা রয়ে গেল। এ সুযোগে মনোরঞ্জন মালো সুন্দরী সৌদামিনীর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা শুরু করে। সৌদামিনী উত্তরাধিকারসূত্রে ধানি জমি, বসতবাড়ি, পুকুর, ফলের বাগানসহ কয়েক একর সম্পত্তির মালিক হয়। সৌদামিনীর সাহস ও লোকপ্রীতির কারণে জ্ঞাতি দেবর মনোরঞ্জন সৌদামিনীর কিছুই করতে পারেনি। সন্তানহীন প্রৌঢ়া সৌদামিনী মাতৃহৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য দূরদেশ থেকে আনা একটি শিশুকে সন্তানের মতো পালন করতে থাকে। মনোরঞ্জন তখন নমশূদ্রর ঘরে ব্রাহ্মণ সন্তান পালিত হচ্ছে বলে অপবাদ দিয়ে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজে ধর্মানুভূতির ধুয়া তুলে সৌদামিনীকে সমাজচ্যুত করার উদ্যোগ নেয়। সমাজের চাপে সৌদামিনী তার পালিত পুত্র যে মুসলমানের ঔরসজাত– এ সত্য প্রকাশ করে। এদিকে সৌদামিনীর পালিত সন্তান হরিদাস নিজের পরিচয় জানতে পেরে নিরুদ্দেশ হয়, আর এই শোকে সৌদামিনীর মানসিক বিকৃতি ঘটে। ব্রাদার জনের প্ররোচনায় স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে বাধ্য হয়। মানুষের লোভ ও ধর্মান্ধতার কাছে মাতৃহৃদয় চূর্ণ হলেও মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়। মাতৃত্বের কাছে ধর্ম ও অর্থের পরাজয় ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. জগদীশ মালোর পেশা কী ছিল?**

ক. আরদালি
খ. পাদ্রি-সহকারী
গ. নিলাম ডাককারী
ঘ. স্বদেশি নেতা

**৬. 'সৌদামিনী মালো' গল্পে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বলতে বোঝানো হয়েছে–**

ক. সত্যবাদিতার ভানকারী
খ. দাতা
গ. নারী শ্রমিক
ঘ. কৈবর্ত জাতি

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভারতবাসী। তাই দেশব্যাপী শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। এই স্বদেশীদের অনেকেই ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন।

**৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সৌদামিনী মালো' গল্পে কোন চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়?**

ক. মনোরঞ্জন মালো
খ. জগদীশ মালো
গ. সৌদামিনী মালো
ঘ. ব্রাদার জন

**৮. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সৌদামিনী মালো' গল্পে স্বদেশী বাবুর চেতনা–**

i. সমধর্মী
ii. বিপরীতধর্মী
iii. প্রায় সমধর্মী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৯. 'মুখজবানি' শব্দের অর্থ কী?**

ক. মুখের ভাষা
খ. গুঞ্জন
গ. ভরা জোয়ার
ঘ. বিদ্বেষ

**১০. হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন?**

ক. সমাজের চাপে
খ. সৌদামিনীর অনাগ্রহে
গ. আত্মসম্মানের কারণে
ঘ. মনোরঞ্জনের কূটিলতায়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

গত শুক্রবার ওয়াজ মহফিলে বয়ান করা নিয়ে বড় হুজুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় কয়েকজন মুসুল্লির। রাতে দেখা গেল বড় হুজুরের দহলিজখানাটি ভাঙা সমাপ্ত হয়েছে।

**১১. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন বাক্যটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল
খ. ক্ষিপ্ত জান্তার সামনে সে এবার বোমা ফাটাল
গ. তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না
ঘ. তাই ধর্মপুত্ররা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে

**১২. উদ্দীপক ও 'সৌদামিনী মালো' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে–**

i. ধর্মীয় বিরোধ
ii. ধর্মের উদারতা
iii. ধর্মীয় গোঁড়ামি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি উদার মানবিক সম্পর্কের। এ গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গল্পটিতে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বন্ধন তা ধনসম্পদে নয় গড়ে ওঠে নিবিড় অপত্য স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে। আমাদের সামাজিক জীবনধারা যে অনেকটা সংকীর্ণতামুক্ত এ সত্যটিও গল্পে ফুটে উঠেছে।

ক. সার্মান কী?

খ. 'মনোরঞ্জন এই ঢিলে পাখিকে কাত করে ছাড়লে।' কীভাবে? –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্ত সৌদামিনী মালো চরিত্রের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'সৌদামিনী মালো' গল্পে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোদের জাত যাবে
জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।

ক. সৌদামিনী মালো কোন এলাকার অধিবাসী?

খ. 'মজা দেখে আর কাজ নেই' –কেন?

গ. উদ্দীপকটি 'সৌদামিনী মালো' গল্পের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'সৌদামিনী মালো' গল্পের চেতনা একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

সার্মান হচ্ছে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জার বেদি থেকে প্রদত্ত ধর্মীয় বা নৈতিক অভিভাষণ।

**খ.**

'সৌদামিনী মালো' গল্পে 'ঢিল' বলতে ধর্মকে বোঝানো হয়েছে।

সৌদামিনী মালো স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক সম্পত্তির মালিক হয়। এই সম্পত্তি তার জ্ঞাতি দেবর মনোরঞ্জন ছলে-বলে-কৌশলে নিজের হস্তগত করার চেষ্টা করলেও দৃঢ়চিত্ত সৌদামিনীর সাহস ও লোকপ্রীতির কারণে কখনো তা পেরে ওঠেনি। তাই সে অন্য কৌশল অবলম্বন করে। সে সৌদামিনীর পালিতপুত্রকে ব্রাহ্মণের সন্তান বলে প্রচার করে। এতে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজের ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে। হিন্দু সমাজ তাকে সমাজচ্যুত করার উদ্যোগ নেয়। সমাজপতিদের চাপে পড়ে সৌদামিনী তার পালিত সন্তান যে মুসলমান ধর্মজাত এ তথ্য প্রকাশ করে। পরিণতিতে সৌদামিনী স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে বাধ্য হয়। আলোচ্য গল্পে 'ঢিলে পাখিকে কাত করা' বলতে এটিকেই বোঝানো হয়েছে।

**গ.**

উদ্দীপকে 'সৌদামিনী মালো' চরিত্রে অপত্য স্নেহের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মাতৃহৃদয় নিবিড় স্নেহের অন্যতম উৎস। এটি ধর্ম-বর্ণ মানে না। মাতৃহৃদয়ের বাঁধন স্নেহ-মমতা-প্রীতির। এটি হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা একেবারে অকৃত্রিম। কোনো প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ এখানে সম্পৃক্ত নয়।

'সৌদামিনী মালো' গল্পে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয়ের কথা বলা হয়েছে। সন্তানের জন্য তার মাতৃহৃদয়ে হাহাকার শোনা যায়। সৌদামিনীর মাতৃত্বের কাছে ধর্ম কিংবা অর্থ স্থান পায় নি। তার পালকপুত্র হরিদাস যবন সন্তান হলেও সে পরম মমতায় হরিদাসকে লালন-পালন করেছে। উদ্দীপকেও এ ভাবটি পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকে উদার মানবিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে নিবিড় অপত্য স্নেহ ও শ্বাশত আন্তরিকতার কথা। মূলত অপত্য স্নেহের দিক থেকে 'সৌদামিনী মালো' চরিত্রটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ.**

'উদ্দীপক এবং 'সৌদামিনী মালো' গল্পে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে' –মন্তব্যটি যথার্থ।

সভ্যতার ইতিহাসে মানবিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। কেননা মানবিকতার নিকট পৃথিবীর সকল কিছু হার মেনে যায়। পার্থিব সকল প্রতিকূলতা ধুয়ে-মুছে যায় এই মহাশক্তির কাছে। ধর্ম-জাতি-বর্ণ সকল কিছু এখানে একাকার হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে মানবতার জয়গান গাওয়া হযেছে। বলা হয়েছে নিবিড় স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা আর মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা। মানুষের স্নেহ ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যা পাওয়া যায় তা ধন-সম্পদের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে 'সৌদামিনী মালো' গল্পে দেখা যায়, সৌদামিনীর মাতৃহৃদয় অকৃত্রিম ও অম্লান। যদিও তা মানুষের লোভ ও ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রাপ্ত হয়েছে। তার অনন্ত হাহাকারের মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে মানবতার জয়গান। সৌদামিনীর মাতৃত্বের কাছে ধর্ম, অর্থ সকল কিছুর পরাভব ঘটেছে।

উদ্দীপকে উদার মানবতার কথা বলা হয়েছে। মানব হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার মাধ্যমে মানবতার বন্ধন পোক্ত হয়। ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-জাতি সবকিছুর ব্যবধান ঘুচে যায় উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলে। 'সৌদামিনী মালো' গল্পেও লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম ও আর্থিক অবস্থানে থাকা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সবশেষে বলা যায়, 'উদ্দীপক এবং 'সৌদামিনী মালো' গল্পে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে' মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

কাঙালির মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাহার রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপুত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যি মানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো– আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালির হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন ! সে ত সোজা কথা নয়।

ক. কেরোসিন ব্ল্যাক মার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলে কে?

খ. সৌদামিনী মালো কীভাবে বোমা ফাটিয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের কাঙালির মা'র সঙ্গে সৌদামিনী চরিত্রের অমিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সৌদামিনী মালো' গল্পের চেতনাকে ধারণ করেনি।" –যুক্তিসহ আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. খ ৯. ক ১০. গ ১১. ক ১২. গ

# বায়ান্নর দিনগুলো

## শেখ মুজিবুর রহমান

## লেখক-পরিচিতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও জাতির জনক। তাঁর জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে দেশব্যাপী সফরের মাধ্যমে মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেন। বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে এক সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে অসহযোগের ডাক দেন তিনি। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফেরেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে ব্রতী হন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবদ্দশায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৭৩ সালে তিনি 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

## ভূমিকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বায়ান্নর দিনগুলো' তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও সহধর্মিণীর অনুরোধে তিনি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় এই আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। এখানে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই রচনায় তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন, বিনাবিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখা, ১৯৫২ সালের জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তি লাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে।

### সাধারণ উদ্দেশ্য

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'বায়ান্নর দিনগুলো' পড়ার পর আপনি–**

- ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের ইতিহাস জানতে পারবেন।
- অনশনরত রাজবন্দিদের সাথে তৎকালীন জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রজনতার মিছিলে গুলি এবং জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার হৃদয়স্পর্শী বিবরণ জানতে পারবেন।

# পাঠ-১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের পরিচয় দিতে পারবেন।
- বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাঁদের বললাম, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই। আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে, সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়। মোখলেসুর রহমান সাহেব খুবই অমায়িক, ভদ্র ও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি খুব লেখাপড়া করতেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কী? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে! প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে দেখেই বলে বসল, "ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে।" আমি বললাম, "কিসমত"। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না। যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। ওপরওলাদের টেলিফোন করল এবং হুকুম নিল থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, "জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।"

জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, জাহাজে অনশন করি কী করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না। আমরা দুইজনে জেল সিপাহিদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম। সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম, "জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, চলেন কিছু নাশতা করে আসি।" নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মীরা জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি। আধাঘণ্টা দেরি করলাম, কাউকেও দেখিনা-চায়ের দোকানের মালিক এসেছে, তাকে আমি আমার নাম বললাম এবং খবর দিতে বললাম আমার সহকর্মীদের। আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি, এমন সময় আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন–সকলে মহি বলে ডাকে, তার সঙ্গে দেখা। আমি যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলাম, তখন আমার সাথে সাথে কাজ করেছে। মহি সাইকেলে যাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ডাক দিলাম নাম ধরে, সে সাইকেল থেকে আমাকে দেখে এগিয়ে আসল। আইবি নিষেধ করছিল। আমি শুনলাম না, তাকে এক ধমক দিলাম এবং মহিকে বললাম, আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি সকলকে এ খবর দিতে।

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছেন। আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করবার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ। মহিউদ্দিন ভুগছে প্লুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে। চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপদ! নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে। সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয়। এদের কথা হলো, "মরতে দেব না।"

আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই-তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। রক্ত আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপত্তি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভেতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ-ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জন সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছিলেন। বার বার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার ও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই। আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হয় ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই। একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু-একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ,

ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' বললেই তো হতো। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**অনশন ধর্মঘট–** কোনো ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষে একটানা আহার বর্জনের সংকল্প। **ডেপুটি জেলার–** উপ-কারাধ্যক্ষ। **প্লুরিসিস–** বক্ষব্যাধি। **বেলুচি–** পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোক। **ভিক্টোরিয়া পার্ক–** ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার নামে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত উদ্যান। বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ্ পার্ক। **মহিউদ্দিন–** মহিউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭)। রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ও পরে প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন তিনি। ১৯৭৯-১৯৮১ কালপর্বে তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ছিলেন। **রেণু–** বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও দুঃসময়ের অবিচল সাথি। **সুপারিনটেনডেন্ট–** তত্ত্বাবধায়ক।

## সারসংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। এ জীবনীগ্রন্থে স্থান পেয়েছে মহামানবতুল্য এ মানুষটির জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ। গ্রন্থভুক্ত আলোচ্য অংশটিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ঢাকার রাজপথে জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন। এই স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি। এতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্রজনতার মিছিলে পুলিশের গুলিচালনার খবর।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. 'রেডিওগ্রাম' শব্দের অর্থ কী?**

ক. স্যাটেলাইট বার্তা
খ. ক্ষুদে বার্তা
গ. বেতার বার্তা
ঘ. টেলিগ্রাম বার্তা

**২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে অনশন করেছিলেন কেন?**

ক. সরকারকে শিক্ষা দিতে
খ. জেলারকে শিক্ষা দিতে
গ. দাবি আদায় করতে
ঘ. মুক্তি পাওয়ার জন্য

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

"১. রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
২. রাজবন্দীদের মুক্তি চাই
৩. শেখ মুজিবের মুক্তি চাই
৪. নুরুল আমিন নিপাত যাক।"

**৩. উদ্দীপকের শ্লোগানগুলো 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন বৎসরটিকে মনে করিয়ে দেয়?**

ক. ১৯৫১
খ. ১৯৫২
গ. ১৯৫৩
ঘ. ১৯৫৪

**৪. উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় প্রকাশিত হয়েছে–**

i. ক্ষোভ
ii. অনুরাগ
iii. দেশপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

## পাঠ-২

### পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় সংঘটিত গুলিবর্ষণ ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বঙ্গবন্ধুর অনশন ভঙ্গ, মুক্তিলাভ এবং তাঁর পরিবারের উৎকণ্ঠা বর্ণনা করতে পারবেন।

### মূলপাঠ

২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। দু-একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃদ্ধ খান সাহেব ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর বাইরে নাই।

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি-ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, "এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।" আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, "অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।" ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?" বললাম, "দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।"

আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হার্টের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না। একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত-পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না, কারণ প্লুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বার বার আব্বা, মা, ভাইবোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত।

মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দুজনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময়-অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বোধহয় আর দু-একদিন বাঁচতে পারি।

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, "আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?" বললাম, "মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।" ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে, চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।" তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, "তোমার অর্ডার এসেছে।" আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন, "আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই; আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে।" ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছেন। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, "তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব।" দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল।

সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্যশক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে, দুই দিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না, তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ, আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কি না! আজই টেলিগ্রাম করব, তারা যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব, বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, "আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।" আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।

পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা।
পাঁচদিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।" একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি

এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী উপায় হতো? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কী হতো? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হতো না। মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা?' আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, "উপায় ছিল না।" বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ-আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিনও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনালেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাক্তার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিন দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেলবেলা। আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।" কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছু আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে।

১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং ছোট ছোট হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে। মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। তাঁরাও ভয় পেয়ে গেছেন। এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

[সংক্ষেপিত]

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ–** গণআজাদী লীগ নেতা। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখেছেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। **আমলাতন্ত্র–** রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা। **কামাল–** বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল। **খয়রাত হোসেন–** রাজনীতিবিদ। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দিন সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। **খান সাহেব ওসমান আলী–** নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা। তিনি আইন সভার সদস্য (এমএলএ) ছিলেন। **খোন্দকার মোশতাক আহমেদ–** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংগঠক। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর ষড়যন্ত্রমূলক ও মর্মান্তিক হত্যায় গোপন সমর্থন ও সহায়তার জন্য নিন্দিত। **ছোট ভাই–** বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের। **নূরুল আমিন–** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রজনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী; বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নূরুল আমিন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। **প্রকোষ্ঠ–** ঘর বা কুঠরি। **রেডিওগ্রাম–** বেতারবার্তা (radiogram)। **হাচিনা, হাচু–** বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

## সারসংক্ষেপ

১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরের জেলখানায় অনশনরত অবস্থায় আটক ছিলেন। ২২ তারিখে সারাদিন এখানে মিছিল হয়, শ্লোগান চলে। আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ২৫ তারিখে সিভিল সার্জন বঙ্গবন্ধুকে পরীক্ষা করেন, তাঁর শরীর ক্রমাগত খারাপ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। ২৭ তারিখে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আদেশ জেলখানায় পৌঁছালো। তিনি অনশন ভাঙলেন এবং পরের দিনই তাঁর বাবার সাথে বাড়ি রওনা হলেন। প্রায় ২৭/২৮ মাস পর তিনি ফিরে এলেন তাঁর পরিবারের কাছে। পরিবার বলতে এখানে তাঁর বাবা-মা ছাড়াও ছিল তাঁর স্ত্রী রেণু ও দুই সন্তান– হাসিনা ও কামাল। ১৯৫২ সারের এই ঘটনার পর বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, এ দেশটাকে যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়; কিন্তু আর দমাতে পারবে না, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। বঙ্গবন্ধু আজীবন প্রতিবাদ, অনশন, ধর্মঘট ও কারাভোগের মাধ্যমে দাবি আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। এসবই করেছিলেন তিনি দেশ ও মানুষের কল্যাণে, মানুষের মুক্তির স্বপ্নে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তির কয়দিন পর বাড়ি পৌঁছেছিলেন?**

ক. তিনদিন　　খ. চারদিন
গ. পাঁচদিন　　ঘ. ছয়দিন

**৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন জীবন দিতে প্রস্তুত?**

ক. দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে　　খ. বাবা-মায়ের জন্য
গ. রাজনীতির উদ্দেশ্যে　　ঘ. ভাই-বোনের জন্য

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

বলেশ্বর গ্রুপের শ্রমিকরা বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে পুলিশ তাদের কয়েকজনকে আটক করে। আটককৃত শ্রমিকরা তাদের মুক্তির দাবিতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করে দেয়। কারা-কর্তৃপক্ষও দমবার পাত্র নন। তারা শ্রমিকদের নাকের ভেতর নল ঢুকিয়ে খাবার খাওয়ান।

**৭. উদ্দীপকের অনশনকারীদের সঙ্গে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কার সঙ্গে মিল রয়েছে?**

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান　　খ. মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ
গ. খয়রাত হোসেন　　ঘ. খান সাহেব ওসমান আলী

**৮. এরূপ সাদৃশ্য যে কারণে–**

i. মানসিক দৃঢ়তায়
ii. অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদে
iii. স্বাস্থ্যবান হবার আশায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল?**

ক. নারায়ণগঞ্জ　　খ. বরিশাল
গ. গোপালগঞ্জ　　ঘ. ফরিদপুর

**১০. 'সে মরাতেও শান্তি আছে।'- বাক্যটিতে বোঝানো হয়েছে?**

ক. অন্যায়ের প্রতিবাদে মৃত্যু　　খ. জেলারের যন্ত্রণায় মৃত্যু
গ. আচরণবিধি লঙ্ঘন করা　　ঘ. ধর্মঘটের কারণে জীবন অবসান

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ইলার স্বামী রাজনীতি করেন। রাজনীতির কারণে তিনি সংসারে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তবুও ইলা মন খারাপ করে না। কারণ সে জানে তার স্বামী দেশের কল্যাণে কাজ করেন।

**১১. উদ্দীপকের ইলার সঙ্গে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কে সাদৃশ্যপূর্ণ?**

i. হাচু
ii. রেণু
iii. মহিউদ্দিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

**১২. উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ফুটে উঠেছে–**

i. স্বামীর প্রতি আস্থা
ii. আত্মত্যাগ
iii. স্বার্থরক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

শোষণ, বৈষম্য আর নিপীড়নের কারণে জার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একসময় ফুঁসে উঠে রাশিয়ার জনগণ। জনগণের নেতৃত্বে ছিলেন মহান নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে জার সরকার তাঁর ওপর শুরু করে নির্যাতন। তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয় সাইবেরিয়ায়। সাইবেরিয়ার বরফাচ্ছাদিত এলাকায় কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে গিয়ে লেনিন একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে দীর্ঘ আটকাদেশের পর তাঁর মুক্তি মেলে। এভাবে তিনি রাশিয়ার মানুষের মুক্তির প্রতীক হয়ে ওঠেন।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় বসে কয়টি চিঠি লিখেছিলেন?
খ. শোষকেরা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায় কেন?
গ. উদ্দীপকের লেনিনের সঙ্গে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার চেতনা একসূত্রে গাঁথা।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

কপিলদাস মুর্মু একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল। ভূমির অধিকার নিয়ে সাঁওতালদের রয়েছে রক্তে রঞ্জিত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ভূমি তাদের অস্তিত্বেরই অপর নাম। তাই নিজেদের বসতবাটি থেকে উন্মুলিত হবার আশঙ্কা যখন তীব্রতর রূপ ধারণ করে তখন বয়সের ভারে ঝিমিয়ে পড়া, অন্য সবার কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মানুষ কপিলদাস অমিত সাহসে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। জীবনের শেষ কাজ হিসেবে শেষ লড়াইটা লড়বার জন্য নিজেকে সে সময়ের হাতে তুলে দেয়। কপিলদাস নিজে কেবল একটি চরিত্র থাকে না; হয়ে ওঠে জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের এক আপসহীন যোদ্ধা।

ক. রেণু কে?
খ. হাচু ভাষা আন্দোলনের শ্লোগান দেয় কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কাকে ইঙ্গিত করে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামই ফুটে উঠেছে উদ্দীপকে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় বসে চারটি চিঠি লিখেছিলেন।

**খ.**

জনমত মুক্তিকামী মানুষের অধিকার আদায়ের সোপান বলে শাসক ও শোষকেরা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায়।

জনমতকে বিবেচনা করা হয় অসামান্য শক্তির আধাররূপে। শোষকশক্তির বিরুদ্ধে জনমত সিডরের মত। বঞ্চিত মানুষ বিক্ষুব্ধ বেদনায় আগুনের লেলিহান শিখার মত আচরণ করে। জনমত লণ্ডভণ্ড করে দেয় শাসকের সব অপকৌশল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, জনমত গণমানুষের অধিকার আদায়ে এক অপূর্ব কৌশল। তাই শাসকেরা প্রচলিত জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায়।

**গ.**

জনতার মুক্তির সংগ্রামের দিক থেকে উদ্দীপকের ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ও 'বায়ান্নোর দিনগুলো' রচনার লেখকের সাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীর সভ্যতা বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সেই আদিকাল থেকে শাসকশ্রেণি শ্রেণিস্বার্থে সাধারণ মানুষের উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছে। আর এই শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ যুগ যুগ ধরে লড়াইও করেছে। সাধারণ মানুষ আন্দোলন ও সংগ্রাম করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

রাশিয়ার সামন্তবাদী জার শাসকগোষ্ঠী সেখানকার সাধারণ মানুষকে নানাভাবে নির্যাতন করত। রাশিয়ার অসহায় মানুষ ব্যাপক নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হওয়ায় লেনিন সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম শুরু করেন। জার শাসকগোষ্ঠী লেনিনকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়। সেখানে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। একসময় তিনি অসুস্থ হযে পড়েন। অবশেষে দীর্ঘ নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। অন্যদিকে 'বায়ান্নোর দিনগুলো' রচনায়ও বর্ণিত হয়েছে মানবমুক্তির কথা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের শিকার হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের এ নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করে বছরের পর বছর বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখা হয়। অবশ্য একসময় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ জনতার চাপে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এভাবে দেখা যায় মানবতার মুক্তিসংগ্রামের কাণ্ডারি হিসাবে লেনিন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।

**ঘ.**

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সমগোত্রীয় ছিলেন।

পৃথিবীতে সময়ে সময়ে কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা নিপীড়িত মানুষের অধিকারের পক্ষে সব সময় সোচ্চার থাকেন। মানব সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ে তারা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিপীড়িত জাতি মুক্তির দিশা পায়।

রাশিয়ার সামন্তবাদী জার সরকার দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে শ্রেণিস্বার্থে শোষকের মতো আচরণ করত। সাধারণ মানুষের উপর তারা বর্বর নির্যাতন চালাত। লেনিন রাশিয়ার এই অবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি রাশিয়ার সামন্তবাদী জার সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। আর এভাবেই সরকারের দ্বারা জীবনের অধিকাংশ সময় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবুও তিনি মানুষের মুক্তির সংগ্রাম থেকে পিছু হটে যান নি। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একই চেতনাকে ধারণ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানি সরকার বাঙালি জাতিকে নানাভাবে শোষণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে সঙ্গে নিয়ে এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শাসকগোষ্ঠীর প্রবল নিপীড়নেও তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি।

রাশিয়ার ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সংগ্রাম করেছেন রাশিয়ার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লড়াই করেছেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এই দুই মহান নেতার কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটি চেতনাগত ঐক্য রয়েছে। তাঁরা উভয়েই আন্দোলন করেছেন মানবতার পক্ষে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে। তাই বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন মানবমুক্তির সংগ্রামী চেতনায় সমগোত্রীয়।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

একটি কবিতা রক্ত পলাশে লেখা
একটি মানুষ পতাকায় আঁকা ছবি
বুকে একতারা শ্যামা দোয়েলের গান
মুজিবুর আজ সারা বাংলার কবি।

ক. 'আমলাতন্ত্র' কাকে বলে?

খ. 'মাতৃভাষা আন্দোলন' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কিংবদন্তির নায়কে পরিণত করেছে।" –উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

## উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. ঘ ৯. গ ১০. ক ১১. খ ১২. ঘ

# রেইনকোট

## আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

## লেখক-পরিচিতি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বগুড়া শহরের নিকটে নারুলি গ্রামে। তাঁর পিতা বদিউজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস ছিলেন পূর্ববঙ্গ পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য, মাতার নাম মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে আইএ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি কলেজে বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন একজন শক্তিমান লেখক। তিনি জীবন ও জগৎকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে সে-সব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে উঠে এসেছে। তিনি লেখার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর না দিয়ে জোর দিয়েছেন লেখার গুণগত মানের ওপর। এদেশের প্রগতিশীল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন ছিল। তাঁর পাঁচটি গল্পগ্রন্থে মোট গল্পের সংখ্যা ২৮টি। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

**আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকর্ম :**

**উপন্যাস** : *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭), *খোয়াবনামা* (১৯৯৬);

**গল্পগ্রন্থ** : *অন্যঘরে অন্যস্বর* **(১৯৭৬)**, *খোঁয়ারি* (১৯৮২), *দুধেভাতে উৎপাত* (১৯৮৫), *দোজখের ওম* (১৯৮৯), *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭);

**প্রবন্ধগ্রন্থ** : *সংস্কৃতির ভাঙাসেতু* (১৯৯৮)।

## ভূমিকা

'রেইনকোট' (১৯৯৫) গল্পটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১' থেকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের পরিস্থিতি নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। গল্পে রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য অসাধারণ। রেইনকোটের মাধ্যমে সাধারণ ভীরু মানুষের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সাহস, উষ্ণতা ও দেশপ্রেম কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তা লেখক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

## সাধারণ উদ্দেশ্য

**আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পটি পড়ার পর আপনি–**

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- একজন মুক্তিযোদ্ধার রেইনকোট কীভাবে এক ভীতু প্রকৃতির মানুষকে সাহসী ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

# পাঠ-১

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক-বাহিনীর বর্বরতার চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা কীভাবে পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখন ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড-কভারের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আর-একপশলা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অন্তত তিন দিন ফুটফাট বন্ধ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কই? ম্যান প্রোপোজেস–। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেস্তে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন। –পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কালেমা সব সময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে। –তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপ্টার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিন্সিপ্যালের পিওন। আলহামদুলিল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটার চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে, "স্যার নে সালাম দিয়া।" বলেই ভাঙাচোরা গালের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শাঁসটুকু শুষে নেয় এবং হুকুম ছাড়ে, "তলব কিয়া। আভি যানে হোগা।"

কী ব্যাপার?

বেশি কথা বলার সময় নাই– কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে।

মানে?

"মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর অয়াপস যানেকা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।"

ভয়াবহ কাণ্ড। ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালান পার হয়ে ফুঠবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বাঁ দিকে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজের জিমন্যাশিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিনসিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ক্রস করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, "ক্যায়সে?"

প্রিনসিপ্যালের পিওন জানবে কী করে? "উও আপ হি কহ সকতা।"

মানে? সে-ই বা বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি? –তার মাথাটা আপনাআপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে, "ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগা।"

'নেহি।' নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, "আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।"

কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়, রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়ত ডেমোটেড হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলে। আরও নিচেও নামাতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঠেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।

"যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার–।" বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিনসিপ্যালের ধমকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আল্লাই জানে! ফায়ারিং স্কোয়াডে যদি দাঁড় করিয়েই দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে গুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিনসিপ্যাল কি তার জন্যে কর্নেলের কাছে এই তদবিরটুকু করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিনসিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই গেছে প্রথমেই কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশের একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই। তা প্রিনসিপ্যাল তাদের এত বড়ো একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে গুলি করার সময় শরীরের আলতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানবে না? আবার প্রিনসিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের জন্যে এতটুকু করবে না?

প্যান্টের ভেতর পা গলিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ বলছে, "তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়।"

এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী? –রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশন নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুশমনকে সম্পূর্ণ কব্জা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম। প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ শোনা যায়, আওয়ার আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্য সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেনটেটিভ্স অব দ্য পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি, আই মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মন্ত্রীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ তার এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে পারা যায় না।

"এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।" বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা গেল, "তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।"

ইস! আবার মিন্টু। বৌয়ের এই ভাইটার জন্যেই তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা যায় না, ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে। ও চলে যাবার তিনদিন পরেই পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলা তার বৌকে জিগ্যেস করেছিল, "ভাবি, আপনার ভাইকে দেখছি না।" ব্যস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাবার জন্যে লেগে গেল হন্যে হয়ে। মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের তলার ভদ্রলোক একদিন বলছিল, "আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না। যে গোলমাল, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।" শুনে বুকটা তার টিপটিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ তোলে? নিরাপত্তার জন্যেই সে এখানে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। শহর থেকেও দূরেই বলা যায়। ভেবেছিল নতুন এলাকা, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো

অস্ত্র ঢুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যিখানে। মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সে-ও জানে তার বৌ-ও জানে। কিসিনজার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। –মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িঘর, গ্রাম, বাজারহাট জ্বালিয়ে দিচ্ছে, –কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। এসব হলো ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। –না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াও ঠিক নয়। নিচের ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজাকার। সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়।

"দেখি তো, ফিট করে কিনা।" আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে দিতে বলে, "মিন্টু তো আমার চেয়ে অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?" –দেখো, ফের মিন্টুর দৈর্ঘ্যের তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

"ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।" এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়।

"আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।" আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে–। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ।

তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, "আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী। তাই না?"

এ তো ভাবনার কাথা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুনরূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়। না–! খামাখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ নাই? প্রিনসিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ ঠিকই বলে, "শোনেন, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইন্‌ভলভ্‌ড।" তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ক্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, –সে কখনো এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করেছে? কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ক্লাশট্লাশ সব বন্ধ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইম্‌লি যায়। স্টাফ রুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে, –কই, সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিনসিপ্যালের কামরায়। ড. আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়েন্টদের আশু ও অবশ্যম্ভাবী পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনে। ওই ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে।

মিন্টুর ফেলে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিনসিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**'আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়্ সব পরফসরকো এত্তলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।'–** 'আবদুস সাত্তার মৃধার বাসায় যেতে হবে। আপনি এখনই আসুন। এক কর্নেল সাহেব এর মধ্যেই চলে এসেছেন। সব প্রফেসরকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি আসুন।' **'উও আপ হি কহ সকতা'–** 'সেটি আপনিই বলতে পারেন।' **ওয়েলডিং ওয়ার্কশপ–** ঝালাই কারখানা। **'ক্যায়সে?'–** 'কীভাবে?' **জেনারেল স্টেটমেন্ট–** সাধারণ বিবৃতি। **ট্রান্সপারেন্ট–** স্বচ্ছ। **'তলব কিয়া। আভি যানা হোগা'–** 'তলব করেছেন। এখনই যেতে হবে।' **'মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর ওয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা।**

**গেট তোড় গিয়া।'–** 'মিসক্রিয়েন্টরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছে। আবার ফিরে যাওয়ার সময় প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়তে গ্রেনেড ছুড়েছে। গেট ভেঙে গেছে।' **মিসক্রিয়ান্ট–** দুষ্কৃতকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবাহিনী এই শব্দটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে। **সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ–** রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে এভাবে অভিহিত করত। **স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশন–** সুনির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ।

## সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এ গল্পের ঘটনাবলি গল্পের কথক নুরুল হুদার জবানিতে বিবৃত হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের কারণে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ বাঁচার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করতো। এ গল্পের কথকও পাকবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক সুরা মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বের হয়ে পাঁচ কালেমা সবসময় প্রস্তুত রাখে ঠোঁটের ওপর। কলেজের পিওন ইসহাকসহ অনেক প্রফেসর পর্যন্ত উর্দু ভাষা শিখেছে। নুরুল হুদা পাকিস্তানি আর্মির ভয়ে দরজার কড়া নাড়া শুনেই দোয়া ইউনুস পড়তে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইসহাকের মতো তোষামোদী চরিত্রের মানুষগুলো পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করে। ইসহাক কলেজের প্রিন্সিপালের আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করে এবং বাংলা ছেড়ে উর্দুতে কথা বলে। সে কাউকে পরোয়া করে না, নুরুল হুদার ওপরও ছড়ি ঘোরায়। ইসহাকের মতো আকবর সাজিদ, প্রিন্সিপাল গং পাকবাহিনীকে গ্রামে ডেকে এনে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও মানুষ হত্যা করে। এমনকি, পাকবাহিনীর কাছে ভালো হওয়ার জন্য সুন্দরী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. 'রেইনকোট' গল্পে বৃষ্টি কখন থেকে শুরু হয়েছে?**

ক. সকাল　　খ. ভোর
গ. বিকাল　　ঘ. সন্ধ্যা

**২. 'মিসকিরিয়ান লোগ' বলতে বোঝানো হয়েছে–**

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের　　খ. বাংলাভাষীদের
গ. মিলিটারিদের　　ঘ. উর্দুভাষীদের

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ছোট শিশু মেনন। বয়স কতইবা, তিন অথবা চার। একা একা বাইরে বের হতে পারে না। সে ঘরের জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্লোগান দেয়– 'ইয়াহিয়ার গোষ্ঠী কিলাই, রাজাকারের গোষ্ঠী কিলাই, পাকিস্তানির গোষ্ঠী কিলাই।' শত্রুপক্ষের ভয়ে মা মেননকে জানালা থেকে সরিয়ে আনেন।

**৩. উদ্দীপকের মেনন 'রেইনকোট' গল্পে কার কথা মনে করিয়ে দেয়?**

ক. মিন্টু　　খ. কর্নেল
খ. আকবর সাজিদ　　ঘ. ড. আফাজ আহমদ

**৪. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে ফুটে উঠেছে–**

i. দেশদ্রোহিতা
ii. দেশপ্রেম
iii. বিশ্বাসঘাতকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

# পাঠ-২

## পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- পাক-বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণসহ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা লিখতে পারবেন।
- পাক-বাহিনীর ক্যাম্পে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সমর্থকদের অত্যাচার করা হতো, সে-সব চিত্র সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ, –ওদের তো একেক গুষ্টির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ-হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত-শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উত্তরেই। মিলিটারি লরির ল্যাজটাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগন্ধ নেই। বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের ছোট দোকানটার ঝাঁপ একটুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উত্তরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোঁড়াটা বিড়বিড় করে, কাল শোনেন নাই? মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাত্রী কম। না, না, কন্ডাক্টররা সবসময় যেমন– খালি-গাড়ি বলে চ্যাঁচায়, সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি পড়তে লাগল বাসের ভিজে মাটিতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অন্তত টিটকারি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না।

ঠোঁটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব হয়ে গেলেও কেউ টুঁ শব্দটি করছে না? তার পোশাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি?

খালি রাস্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ওই সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে, 'রাখো রাখো' বলতে বলতে ঝুঁকি নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলন্ত বাস থেকে। সে তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা দুটোই পকেটমার। নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুৎসই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোমে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তাতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। হুঁ! এদেরও সে ঠিক চোর অথবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বস্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা ছোটে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি কোথাও

লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্যে অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে পড়ে ঝটপট পায়। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। তার মানে তাকে বেশ ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরত।

যাক, মিন্টুর রেইনকোটে তার কাজ হচ্ছে। চোর ছ্যাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা থাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

আসাদ গেট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামালে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন 'আরে রাখো রাখো' এবং একজন 'রোখো-রোখো' বলতে বলতে নেমে পড়ল ধড়ফড় করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অর্ডিনারি চোর, ছিঁচকে চোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার। ফের নতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টি আঁশ উড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছপালা, লোকজন, দোকানপাট ও বাড়িঘরের ওপর ট্রান্সপারেন্ট আবরণ দেখে তার এক্সট্রা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো-লাগাটা চিড় খায়, বাস হঠাৎ করে ব্রেক কষলো। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে, চোখ পড়ে নির্মীয়মাণ মসজিদের ছাদের দিকে, দরজা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া ঢুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগে; ক্রাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন সাহেব। ঠাণ্ডা হওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুঝি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিনতলায় থাকত তখন তারা। রাতভর ট্যাঙ্কের হুঙ্কার আর মেশিনগান আর স্টেনগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়নি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিলে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং বন্ধ জানালার পর্দা একটু তুলে সে রাস্তা দেখতে থাকে। রাস্তার ওপরে মসজিদের ছাদে মোয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়েছিল আজান দিতে। সাধারণত জুমার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানালার ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেক্ট্রিসিটি নষ্ট, মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো। মোয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল 'আল্লাহু আকবার'। দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। তো কোনো নামাজের ওয়াক্ত নেই, তবে আজান দেওয়াবে কী করে? এরা বোধ হয় যে কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ত ঘোষণা করে নতুন হুকুম জারি করেছে।

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভিতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগ বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে দ্রাম-দ্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হল্‌কা বেরোয় তার চোখ দিয়ে। তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে। মিলিটারির চোখ ছুঁচালো হয়ে আসে এবং ছুঁচালো চোখের মণি কাঁটার মতো বিঁধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভোঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে, ছুঁটলো চোখে, গোঁফের নিচে ও নাক, গোঁফ ও চোখের আশপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে, নেমে পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মনে হয় রেইনকোটের পানির ফোঁটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোঁটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোঁটা গোণাগুনতি সেরে মিলিটারি হঠাৎ বলে,

'আগে বাঢ়ো' বাস হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের স্বস্তির নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায় এবং হুকুম করে, 'রাখেন নামবো'। বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমানো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপরাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট বাঁকায়, এতে তার সামনের সারি দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

প্রিন্সিপালের কামরায় প্রিন্সিপালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা। তার ভারিক্কি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পান্ডাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে প্রিন্সিপালের কালো মুখ বেগুনি হয়, ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি, ই পি এস ই এস হওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্যার বলে, 'হি ইজ প্রফেসর হুদা।'

কিন্তু ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি নিজের ভুল সংশোধন না করে পারে না, 'সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি।

'শাট আপ।'

এবার প্রিন্সিপাল থামে।

তাকে এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে নিয়ে মিলিটারি জিপে তোলার আগে জাঁদরেল কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার প্রিন্সিপালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিন্সিপালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্বিগ্ন হয়, সাজিদ সাহেব যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এই মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল এঁকেবেঁকে। মস্ত উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক্-চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ওই আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি করে। ঠেলাগাড়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে।

নুরুল হুদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোত্থেকে? তারা হলো কুলি, সে একজন লেকচারার।

তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন?

প্রিন্সিপালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার, তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল–।

মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

'আমার নাম? সত্যি বলেছ? আমার নাম বলেছ?' নুরুল হুদার হঠাৎ চিৎকারে মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে, কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে।

নুরুল হুদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেঁষে! তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি নিয়ে সে কি যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে, 'বর্ষাকালেই তো জুৎ'। কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী?

স্টাফরুমে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসফিস করছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদেও জেনারেল মনসুন। –ওই ছদ্মবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুঝিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্থা? –উৎসাহে নুরুল হুদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌনতা মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেগে দুটো ঘুষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘুষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘুষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'!

ওই ঠিকানাটা বলে দিলেই তো তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাঁকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, হ্যাঁ'। কিন্তু পরের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য একটি ঘরে। তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাৎ সপাৎ করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিচুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হুদার কাছে মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**ক্রাক-ডাউনের রাত–** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে সেই রাতের কথা বলা হয়েছে। **ছদ্মবেশী**-আত্মপরিচয় গোপন করেছে এমন। **মৌনতা–** নীরবতা। **রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার আমাদের জেনারেল মনসুন–** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রবল বর্ষায় তেমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে সেই বিষয়টির তুলনা করা হয়েছে।

## সারসংক্ষেপ

গেরিলা আক্রমণের ঘটনা যে রাতে ঘটে তার পরদিন সকালে ছিল বৃষ্টি। তলব পেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি গায়ে দিয়ে নুরুল হুদা কলেজের দিকে রওনা দেয়। রেইনকোটটি গায়ে দেয়ার পর ভিতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে ভিন্ন অনুভূতির জন্ম হয়। নুরুল হুদার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে ঢাকায় গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। তেমনই একটা ঘটনা এ গল্পের বিষয়। ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলারা আক্রমণ করে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে দেয়। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাক সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে। তাদের মধ্যে নুরুল হুদা এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর নিতে চেষ্টা করে। নুরুল হুদা প্রিন্সিপালের জরুরি তলবে কলেজে যাবার সময় বৃষ্টির জন্য তার মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি পরে নেয়। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু নুরুল হুদার ভেতর যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম দেখা যায় তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে এ পাঠ্যাংশে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**৫. অফিসের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল?**

ক. দুইটি　　খ. তিনটি
গ. চারটি　　ঘ. পাঁচটি

**৬. পিয়নকে দেখে সবাই তটস্থ থাকেন কেন?**

ক. আচরণের জন্য　　খ. মিলিটারির কারণে
গ. রাজাকার বলে　　ঘ. মিলিটারির সঙ্গে সুসম্পর্কে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।

**৭. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?**

ক. নুরুল হুদা　　খ. সাজিদ আকবর
গ. আবদুস সাত্তার মৃধা　　ঘ. ইসহাক

**৮. উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে?**

i. দেশপ্রেম
ii. মানবিকতা
iii. নৃশংসতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii.
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৯. 'রেইনকোট' গল্পে কোথায় বোমা ফেলা হয়েছিল?**

ক. কলেজের জিমনেশিয়ামে　　খ. বাগানে
গ. প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে　　ঘ. গেমস্ রুমে

**১০. মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো হয়েছে যে কারণে?**

ক. প্রিন্সিপালের ভয়ে　　খ. কর্নেলের হুকুমে
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে　　ঘ. বিদ্যুৎ না থাকায়

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল ভয় আর উৎকণ্ঠা। সে সময়ে অনেক তরুণই দেশের জন্য পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা ভয়কে জয় করেছে।

**১১. উদ্দীপকের তরুণদের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. মিন্টু　　খ. ড. আফাজ আহমেদ
গ. নুরুল হুদা　　ঘ. ইসহাক

**১২. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–**

i. নিষ্ঠুরতা
ii. সাহসিকতা
iii. স্বজনপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

মেলাঘর কতদূর ! মা কী কল্পনা করতে পারেন ? কিন্তু সেখানেই গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় মায়ের ছেলে নাফি। নাফির চোখে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নছবি লালসবুজের পতাকা। মেলাঘরে প্রশিক্ষণ শেষে নাফি মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা ইউনিটে কমান্ডো হিসাবে কাজ করে। হৃদয়ের টানে তার নিকট মা আর মাতৃভূমি একাকার বলে মনে হয়।

ক. রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদাকে কার মতো দেখাচ্ছিল?

খ. 'রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন' –কথাটির তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকের নাফি 'রেইনকোট' গল্পে কোন চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? –আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে কী? –মন্তব্যটি বিচার করুন।

**সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :**

'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম এলাকার আনসার, চৌকিদার-দফাদাররাও যে কখনো কখনো পরোক্ষ কৌশলে অত্যন্ত গোপনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল, সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে এ গল্পে। গ্রামবাংলার একজন সাধারণ দফাদারের দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় গল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ক. প্রিন্সিপালের উর্দুচর্চা নিয়ে ঠাট্টা করে কে?

খ. 'আব্বু তাহলে মুক্তিবাহিনী' –কথাটি কে, কোন প্রসঙ্গে বলেছিল?

গ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশিত হয়নি।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদাকে মিন্টুর মত দেখাচ্ছিল।

**খ.**

উক্তিটিতে বাংলাদেশে বর্ষার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীকে বিপর্যস্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হিটলার বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে বৈরি পরিবেশের মুখোমুখী হয়। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। সেখানে শীতের ভূমিকা অনেকটাই প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেনারেলের মত হয়েছিল। আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলেও বাংলাদেশের মৌসুমি আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিল না। ফলে তারা বাংলাদেশে বর্ষাকালে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। মোটকথা বর্ষা ঋতু বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শাপে বর হয়েছে। তাই বর্ষাকালকে জেনারেল মনসুন বলা হয়েছে।

**গ.**

উদ্দীপকের নাফি চরিত্রটি 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। মাতৃভূমি বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে এদেশের দামাল ছেলেরা ১৯৭১ সালে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুকে অজেয় করে তারা শত্রু হননের শপথ নেয়। তাদের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর।

উদ্দীপকে নাফি একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মেলাঘরে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেয়। অতঃপর সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মেলাঘর কতদূর তা তার মা কল্পনা করতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাফি শত্রুসেনাদের নিশ্চিহ্ন করে। উদ্দীপকের নাফি চরিত্রটির মিল রয়েছে 'রেইনকোট' গল্পের মিন্টুর সঙ্গে। মিন্টুও বাসা

থেকে পালিয়ে গেরিলা যুদ্ধে দেয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সেও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে।

**ঘ.**

উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সমগ্র চেতনাকে ধারণ করে না।

স্বাধীনতা যে কোন জাতির স্বপ্নিল প্রত্যাশা। বাঙালি জাতি এ প্রত্যাশা পূরণ করেছে ১৯৭১ সালে। লাখো বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এ প্রত্যাশা। বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল এ যুদ্ধে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে একজন তরুণের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা। নাফি নামের এই তরুণটি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। অথচ এটা তার মা কল্পনা করতে পারেন না। উদ্দীপকের এ বিষয়টিতে 'রেইনকোট' গল্পের একটি দিকমাত্র ফুটে উঠেছে। এটা দেখা যায় মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ঘটনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু 'রেইনকোট' গল্পে উক্ত বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও উঠে এসেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ঢাকার আবহে রচিত। গল্পটিতে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ, বর্বরতা, রাজাকারদের অত্যাচার, নুরুল হুদার ভীরুতা, প্রাণভয়ে ভীত মানুষের আহাজারি, সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। 'রেইনকোট' গল্পটিকে এককথায় বলা যায় সমকালীন সময়ের সাহিত্যিক দলিল। উদ্দীপকে আলোচ্য গল্পটির উক্ত বিষয়গুলো ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে না।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

প্লিজ, মেজর সাহেব, আই বেগ ইউ, প্লিজ, রহম কিজিয়ে, আমার বিবিকে ছেড়ে দিন। ওকে নিয়ে যাবেন না। আপনারা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? দেন, কিল মি, প্লিজ, ফিনিশ মি, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে চললেন? আউট সাইড? আমি শুনেছি, আপনারা আমাদের দিয়ে আগে গোর খুঁড়িয়ে নেন, তারপর গুলি করেন। প্লিজ, ব্রিং মাই ওয়াইফ ব্যাক; আমরা দুজনেই গোর খুঁড়ব।

ক. আকবর সাজিদ কোন বিষয়ের অধ্যাপক?

খ. নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিক দিয়ে মিল বা অমিল রয়েছে? –যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

ঘ. "মুক্তিযুদ্ধে চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।" –উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. ঘ ৭. ক ৮. ক ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ঘ

# মহাজাগতিক কিউরেটর

## মুহম্মদ জাফর ইকবাল

## লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনা জেলায়। তাঁর পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মাতা আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পিতা একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। পিতার পুলিশের চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে জাফর ইকবালের ছেলেবেলা কেটেছে। তিনি ১৯৬৮ সালে বগুড়া জেলা স্কুল থেকে এসএসসি ও ১৯৭০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে ১৯৯৪ সালে দেশে ফিরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বর্তমানে তিনি সেখানেই কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমিন হকও একই বিভাগের একজন অধ্যাপক। মুহম্মদ জাফর ইকবাল একাধারে পদার্থবিদ, শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট, সায়েন্স ফিকশন লেখক, কথাসাহিত্যিক। তাঁকে বাংলাদেশে সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লেখা ও জনপ্রিয়করণের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর কিশোর উপন্যাস ও ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর একাধিক কিশোর উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ-প্রজন্মকে তিনি গণিত ও বিজ্ঞানমুখী করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধ, মাতৃভূমি ও মানুষকে প্রগতিশীল করার দায়বদ্ধতা থেকে তিনি লিখে যাচ্ছেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

**মুহম্মদ জাফর ইকবালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম :**

**কল্পকাহিনি** : *কপোট্রনিক সুখদুঃখ* (১৯৭৬), *মহাকাশে মহাত্রাস* (১৯৭৭), *টুকুনজিল* (১৯৯৩), *নিঃসঙ্গ গ্রহচারী* (১৯৯৪), *একজন অতিমানবী* (১৯৯৮), *জলজ* (২০০০), *ফোবিয়ানের যাত্রী* (২০০১), *ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা* (২০১৩);

**উপন্যাস** : *দীপু নম্বার টু* (১৯৮৪), *আকাশ বাড়িয়ে দাও* (১৯৮৭), *আমার বন্ধু রাশেদ* (১৯৯৪), *কাচসমুদ্র* (১৯৯৯), *আমি তপু* (২০০৫), *নাটবল্টু* (২০০৮), *গাব্বু* (২০১৩);

**কিশোর সাহিত্য** : *বুগাবুগা* (২০০১), *রঙিন চশমা* (২০০৭), *ঘাস ফড়িং* (২০০৮), *হাকাহাকি ডাকাডাকি* (২০০৮), *ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (২০০৯); *ভূতের বাচ্চা কটকটি* (২০১১), *আরো প্রশ্ন আরো উত্তর* (২০১২)।

## ভূমিকা

'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতি কিউরেটর' গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। অনন্ত মহাজগৎ থেকে আগত মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটরের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহে পৃথিবীতে আসার তথ্য এ গল্পে আলোচিত হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের সময় তারা বুঝতে পারে মানুষের কারণেই ওজন স্তরের হ্রাস ঘটে যাচ্ছে। মানুষই নির্বিচারে গাছ কাটছে এবং পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে যদিও মানুষই সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে কথিত। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে পিঁপড়াকেই শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে লেখক কল্পকাহিনির রসের সঙ্গে সমাজ পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন।

## উদ্দেশ্য

**মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি পড়ার পর আপনি–**

- মহাজাগতিক কিউরেটরদের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- লেখকের বিবেচনায় কেন পিঁপড়েকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী উল্লেখ করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'বেশ পরিণত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে ক্ষুদ্র এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী।'

দ্বিতীয় প্রাণীটি আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ।'

'কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসকে আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাকটেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় স্থির। আলোকসংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙাতেও নানা ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতরে আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।'

প্রথম প্রাণীটি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ।'

'তুমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ।'

প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের নীলনকশা এই ডিএনএ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল– এটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।'

'হ্যাঁ।' দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, 'আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি– কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে– যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল।'

'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।'

'হ্যাঁ'।

'এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে।'

‘গাছপালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।’

‘এই প্রাণটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটাকে বলে সাপ।’

‘সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠাণ্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে!’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ‘হ্যাঁ, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি। তবে–’

‘তবে কী?’

‘এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে?’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত।’

‘এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।’

‘হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?’

‘কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণীটা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে।’

‘ঠিকই বলেছ, গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?’

‘তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান?’

‘কী?’

‘এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশির ভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়।’

‘ঠিকই বলেছ। আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।’

‘আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।’

‘কী?’

‘এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?’

‘কোন প্রাণীর কথা বলছ?’

‘মানুষ।’

‘মানুষ?’

‘হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘এই দেখ এরা শহর-বন্দর-নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।’

‘শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে। পশুপালন করছে।’

‘যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে।’

‘নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছ?’

‘কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে-’

'কী?'

'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?'

'তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?'

'এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ? কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?'

'এর সবই কি মানুষ করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।'

'এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।'

'ঠিকই বলেছ।'

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, 'না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদের বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে।'

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা-ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর গ্রহ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না।'

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে।'

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, 'ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে।'

'কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?'

'শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।'

'অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।'

'মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে।'

'প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করেনি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।'

'ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই?'

'হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।'

দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।

## নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

**এককোষী–** একটিমাত্র কোষবিশিষ্ট প্রাণী। **ওজোন স্তর–** বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোন গ্যাসে পূর্ণ স্তর বিশেষ, যা আমাদের সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। **কিউরেটর–** জাদুঘরের রক্ষক, জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক। **গ্যালাক্সী–** ছায়াপথ। **ডাইনোসর–** লুপ্ত হওয়া বৃহদাকার প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। **তেজস্ক্রিয় পদার্থ–** যা থেকে এমন রশ্মির বিকিরণ ঘটে যা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। **নিউক্লিয়ার বোমা–** পারমাণবিক বোমা। **প্রজাতি–** প্রাণীর বংশগত শ্রেণি। **মহাজাগতিক-** মহাজগৎ সম্বন্ধীয়। **সরীসৃপ–** বুকে ভর দিয়ে চলে এমন প্রাণী।

## সারসংক্ষেপ

'মহাজাগতিক কিউরেটর' মুহম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। এ গল্পের শুরুতে আমরা দেখি মহাজগৎ থেকে আগত মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটর বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের জন্য সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে। কিউরেটরদের পৃথিবীতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রাণীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণ করে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা। প্রজাতির যাচাই-বাছাই করার সময় বিভিন্ন প্রাণীর গুণাগুণ কিউরেটরদের সংলাপে উঠে আসে। তারা মানুষের ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনায় নিলেও নেতিবাচক আচরণগুলো দেখে বিস্মিত হয়। বোমা নিক্ষেপ, বৃক্ষ নিধন, যুদ্ধংদেহী মনোভাবসহ এ জাতীয় নেতিবাচক কাজের জন্য তারা মানুষ প্রজাতিকে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর স্বীকৃতি দিতে পারেনি। কিউরেটরদের উদ্দেশ্য ছিল অনন্ত মহাজগতের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী সংগ্রহ করা। রচনাটিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণী, সরীসৃপজাতীয় সাপ, স্তন্যপায়ী প্রাণী বাঘ, তৃণভোজী প্রাণী হরিণ, গৃহপালিত প্রাণী কুকুর, বৃহৎ প্রাণী হাতি বা নীল তিমি এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের কর্মকাণ্ডে তারা শঙ্কিত। অবশেষে তারা পরিশ্রমী ও সুশৃঙ্খল সামাজিক প্রাণী হিসেবে পিঁপড়াকে শনাক্ত করে। ডাইনোসরের যুগ থেকে এখনো বেঁচে থাকা সুবিবেচক ও পরোপকারী পিঁপড়াকে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করে সঙ্গে নিয়ে যায়। কল্পকাহিনির রসের সঙ্গে সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে লেখকের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং একই সঙ্গে তীব্র শ্লেষ ও পরিহাসের মিশ্রণে গল্পটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**১. পিঁপড়া কোন যুগ থেকে বেঁচে আছে?**

ক. ডাইনোসর　　খ. প্লাইটোসিন
গ. গ্যালাক্সি　　ঘ. নিউক্লিয়ার

**২. মহাজাগতিক কিউরেটররা কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?**

ক. প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজ করতে　　খ. পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড দেখতে
গ. সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীর খোঁজে　　ঘ. প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ভীমরুলের গায়ে হুল আছে। সুযোগ পেলে সে মনোয়ারকেও কামড়াতে ছাড়ে না। কিন্তু তার সামাজিক দায়িত্ববোধ সত্যিই বিস্ময়কর। কোনো ভীমরুলকে সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করলে সে চাক ছেড়ে চলে যায় যাতে অন্যরা ওই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়।

**৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কোন্ প্রাণীর সাদৃশ্য রয়েছে?**

ক. মানুষ　　খ. হরিণ
গ. পিঁপড়া　　ঘ. ভাইরাস

**৪. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে পরিলক্ষিত হয়–**

i. সমাজমনস্কতা
ii. দায়িত্বশীলতা
iii. আত্মত্যাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**৫. কারা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়?**

ক. কুকুর　　খ. বিড়াল
গ. বাঘ　　ঘ. সিংহ

**৬. মহাজাগতিক কিউরেটররা মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলেনি কেন?**

ক. মানুষ বুদ্ধিহীন　　খ. সংকীর্ণতার কারণে
গ. মানুষের আত্মধ্বংসী প্রবণতা　　ঘ. পরোপকারী বলে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

অচিন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে কিটি। সে পৃথিবীতে এসে দেখে মানুষ মারণাস্ত্র তৈরি করে চলেছে। সামান্য কারণে বোমা ফেলে লোকালয় ধ্বংস করছে। কিটির মনে হল মানুষ সভ্য হলেও এক ধরণের আত্মঘাতী প্রাণী।

**৭. অনুচ্ছেদে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কোন বাক্যটির ভাবার্থ প্রতিফলিত হয়েছে?**

ক. প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।
খ. গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?
গ. এরা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে।
ঘ. মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে।

**৮. উদ্দীপক এবং 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের কোন বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে?**

i. সুবিবেচনা
ii. আত্মত্যাগ
iii. আত্মধ্বংস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসেছে এলিয়েনরা। পৃথিবীতে এসে তারা দেখে এটা বৈচিত্র্যময় এক প্রাণিজগৎ। এদের মধ্যে মানুষ নামক প্রাণীটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা তারা সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এলিয়েনরা আরো বুঝতে পারে যে, মানুষের কারণেই এখানে ওজোন স্তরের ক্ষয় হচ্ছে। মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির ভারসাম্য। পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তারাই নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে একে অন্যের উপর। মানুষ প্রজাতির নির্বুদ্ধিতায় তারা শঙ্কিত হয়।

ক. 'কিউরেটর' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই' –কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী।" –উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

## নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

**ক.**

'কিউরেটর' শব্দের অর্থ হচ্ছে জাদুঘর রক্ষক। জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক।

**খ.**

সরীসৃপরা জীবজগতে পিছিয়ে পড়া প্রাণী হওয়ার কারণে কিউরেটররা বলেছে এদেরকে মহাজগতে নিয়ে কাজ নেই।

পৃথিবীর প্রাণিজগৎ বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্যতম প্রাণী হল সরীসৃপ বা সাপ। সরীসৃপ বুকে ভর দিয়ে চলে। এরা জল-স্থল উভয়স্থানেই বাস করে। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা সাধারণত নিয়ন্ত্রিত থাকে না। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এরা স্থবির হয়ে পড়ে। তাই সরীসৃপ জগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে পিছিয়ে পড়া প্রজাতি। এ কারণে মহাজাগতিক কিউরেটরা সরীসৃপকে সঙ্গে নিতে চায়নি।

**গ.**

উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রাণী হলো মানুষ। মানুষের ইতিবাচক আলোড়নের চেয়ে নেতিবাচক আলোড়নটিই চোখে পড়ে বেশি। কেননা মানুষ সভ্যতা নির্মাণে যতটা উদ্ভাবন ও গঠনমূলক কাজ করেছে তার চেয়ে নেতিবাচক কাজের পরিমাণ একেবারে কম নয়। যা মানবসভ্যতা তথা পৃথিবীর ধ্বংস সাধনে সহায়ক হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা এলিয়েনরা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষকে মূল্যায়ন করেছে। তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে, পৃথিবীতে সভ্যতা নির্মাণকারী প্রাণী হচ্ছে মানুষ। কিন্তু মানুষ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে, ক্ষয় করছে পৃথিবীর ওজোন স্তর। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' কল্পকাহিনিতেও ভিনগ্রহের কিউরেটরদের পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে অনুরূপ মূল্যায়ন রয়েছে। কিউরেটররা ধারণা করেছিল পৃথিবী নামক গ্রহে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রাণী হবে মানুষ। কিন্তু তারা মানুষের স্ববিরোধী ও স্ব-প্রজাতির বিনাশকারী কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয়। ফলে তারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে 'মানুষ'কে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ.**

'পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী' –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

সাধারণত দেখা যায় বুদ্ধিমান প্রাণী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে ইতিবাচক কাজে লিপ্ত হয়। মানুষ নগর নির্মাণ করেছে এটা তার ইতিবাচক দিক। কিন্তু এই মানুষই গাছপালা কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে, ওজোন স্তরের ক্ষয় করছে, এগুলো তার নেতিবাচক দিক। মানুষ নিজের স্বার্থে সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে অনন্ত মহাজগৎ থেকে দুজন কিউরেটর পৃথিবীতে এসেছে। তারা পৃথিবীর জীবজগত হতে শ্রেষ্ঠ প্রাণিটি বাছাই করে মহাজগতে নিয়ে যাবে। প্রথমে কিউরেটররা মনে করে পৃথিবীতে মানুষই বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ প্রাণী। কিন্তু মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডে তাদের সে ধারণা পাল্টে পায়। কেননা মানুষ গাছ কাটে, নানাভাবে বায়ুদূষণ করে ওজোন স্তরের ক্ষয় করে, পৃথিবীর পরিবেশ ধ্বংস করে। উদ্দীপকেও মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও হিংসাত্মক প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আবার এই মানুষই সামান্য কারণে সবকিছু ধ্বংস করে শূন্য করে দেয়।

উদ্দীপক এবং 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী রূপটি ফুটে উঠেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে স্বীয় শ্রম আর চেষ্টায় লোকালয় গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই মানুষেরই কর্মকাণ্ডে তার নীড়ে দাবানল বয়ে যায়, ধ্বংস হয় লোকালয়। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। বস্তুত মানবচরিত্রের এই স্বরূপ উদ্দীপক এবং 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

## অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বিষ পিঁপড়ার পা ছেঁড়ার চেষ্টা করা নেহায়েতই বোকামির কাজ, কারণ তখন সেটা টিটনের বুড়ো আঙ্গুলে আবার কামড়ে ধরল। টিটন বলল, "আউ! আউ!" এবং কিছু বোঝার আগে সেই পিঁপড়া তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমে গাছের ডালে তারপর পাতার আড়ালে গিয়ে অন্য পিঁপড়াদের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে ফেলল। সেটাকে আলাদা করে আর খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। টিটন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দেখেছিস? দেখেছিস? বদমাইশ পিঁপড়াটা কী করল?

ক. সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের নাম কী?

খ. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কাকে 'অত্যন্ত সুবিবেচক' বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে পিঁপড়া ও উদ্দীপকের পিঁপড়ার চেতনাগত ভিন্নতা রয়েছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

## উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. গ ৭. খ ৮. গ